Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.1
Pages	৯-৪৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪১৮ ॥ অক্টোবর ২০১১

রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'

Check for updates

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বাংলা ছড়ার বন্ধন তাঁর শৈশব থেকেই। শিশু রবি গড়ে উঠেছিলেন কিশোরী চাটুজ্জের ছড়া, বিষ্ণুর পাড়াগেঁয়ে ছড়া, কৈলাস মুখুজ্জের ছড়ার মধ্যে। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'-এর চার ছত্র তাঁর বাল্যকালের মেঘদূতস্বরূপ। এ বন্ধন আরও দৃঢ় হয় ত্রিশোর্ধ্ব রবীন্দ্রনাথের ছড়া-সংগ্রহ, অন্যকে ছড়া-সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করা, ছড়ার বৈশিষ্ট্য ও ছন্দ নিয়ে প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। তাঁর কাব্যধারায় *সোনার তরী* (১৮৯৪) থেকে বিশেষভাবে এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। *শিশু* (১৯০৩) ও *শিশু ভোলানাথ* (১৯২২)-এ এ-প্রভাব হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছড়া-চর্চা নতুন মাত্রা পায় কবির ৭৫ বছর বয়সে। পরিণত রূপান্তরে নতুন অবয়বে ছড়া ফিরে আসে তাঁর লেখনীতে।

ইতোমধ্যে বাংলা ছড়া ঈশ্বর গুপ্তের "তুমি মা কল্পতরু"[১]-র ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার *খুকুমণির ছড়া* (১৮৯৯)-য় উপস্থাপন করেন প্রায় ৪০০ লোকছড়া, যা পরবর্তী সময়ে বাংলা ছড়ার আঙ্গিক-গঠনে নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে। শুধু সংকলন নয়, যোগীন্দ্রনাথ দু'খণ্ডের *হাসিখুসি* (১৮৯৭,১৯০৪), *হাসি ও খেলা* (১৮৯১), *রাঙা ছবি* (১৮৯৬), *ছড়া ও ছবি* (তা.বি.), *খেলার সাথী* (১৮৯৮), *হাশিরাশি* (১৮৯৯) প্রভৃতিতে ছড়ার চর্চা করে *হিজিবিজি* (১৯১৬)-তে আবির্ভূত হন বাংলার প্রথম আধুনিক ছড়াকার রূপে। আজগুবি-উদ্ভট কল্পনা, ব্যঙ্গকৌতুক, চিত্রধর্মী পদ্য প্রভৃতি লক্ষণের কারণে *হিজিবিজি*-কে বিনা দ্বিধায় *আবোল তাবোল* (১৯২৩)-এর পূর্বপুরুষ বলা যায়। যোগীন্দ্রনাথের এই ছড়াচর্চার মধ্যে পাঠকের হাতে আসে মনমোহন সেনের *খোকার দপ্তর* (১৯০২)। অন্যদিকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করেন *বেণু ও বীণা* (১৯০৬), *তীর্থরেণু* (১৯১০) ও *কুহু ও কেকা* (১৯১২)-য়। প্রকাশিত হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর *মুকুল* (১৮৯৫), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর *সন্দেশ* (১৯১৩) এবং সুধীর চন্দ্র সরকার সম্পাদিত *মৌচাক* (১৯২০)। *সন্দেশ*-এর পাতাতেই (১৯১৩-২৩) সুকুমার রায় বাংলা ছড়াকে পূর্ণরূপে আবিষ্কার ও উপস্থাপন করেন; পরে এগুলো *আবোল তাবোল* (১৯২৩) ও *খাই খাই* (১৯৫০)-তে গ্রন্থভুক্ত হয়। সুনিপুণ শব্দবিন্যাস ও নতুন শব্দ তৈরি, অনুপ্রাস-প্রধান ছন্দ ব্যবহার, যমক ও ধ্বনিঝংকার, মিল ও তালের অপূর্ব সমন্বয়, শ্লেষমিশ্রিত ব্যঙ্গ ও কৌতুক এবং অদ্ভুত ও আজগুবি বিষয় নিয়ে বাংলায় শুদ্ধ ছড়ার জগৎ সুকুমারই প্রথম তৈরি করেন। সুকুমার রায়সহ রায়চৌধুরী পরিবার গড়ে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ির আবহে, সুকুমারের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও ছিল প্রত্যক্ষ। বিশ শতকের বিশের দশকেই সুকুমার রায় বাংলা ছড়ার প্রমিতায়ন সম্পন্ন করেন। দশকের শেষ দিকে প্রকাশিত হয় সুনির্মল বসুর ছন্দ ও ছড়ার প্রশিক্ষণের গ্রন্থ *ছন্দের টুংটাং* (১৯২৯)। বিশের দশকের এই পটভূমিতেই ত্রিশের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথের বাংলা ছড়ার অঙ্গনে বিচরণ।

---

[*]অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ক.

"পরিশেষের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ যতই শেষ বয়সের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন, ততই তাঁর মধ্যে রূপকথার পরিবর্তে ছড়ার প্রভাব বেড়ে চলেছে", যা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে "ছড়ার ছন্দের ব্যবহারে", "ছড়ার ভগ্নাংশ কবিতার অঙ্গীভূত করায়", "কাব্যগ্রন্থের নামকরণে" — আশুতোষ ভট্টাচার্যের এ-অবলোকনে [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৭৩ : ১১৯] রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহে ছড়ার প্রভাবের গতিধারাটি যথার্থভাবেই চিহ্নিত হয়েছে।

এই প্রভাবের প্রথম সার্থক ফসল *খাপছাড়া* (১৯৩৭)। গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভণিতা বা প্রবেশক :

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।
লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।[২]

'ছেলেভুলানো ছড়া : ১'-এ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে এর পাশাপাশি স্থাপন করলে এ-ভূমিকা যে ছড়া-রচনার তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> ...হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। ... সহজ ভাবের অপেক্ষা সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।... এইজন্য ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, ৩ : ৭৫৫]

মূল ছড়াগুলোর আগে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় আবার যেন ছড়ার এবং সেই সঙ্গে ছড়াকারের চেহারাটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন "দাড়িওয়ালা বুড়ো"র "নেশায় পাওয়া চোখটা"য় "যা-তা" আউড়ানির কথায়, যেখানে —

... ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর
ক্ষণকালের ভোজ্‌বাজির এই ঠাট্টা।

রাজশেখর বসুর উদ্দেশ্যে যে উৎসর্গপত্র তাতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আরও স্পষ্ট : বৃদ্ধের খোলস খসিয়ে তিনি ছেলেমি ও চপলতায় সফল ও সিদ্ধ হতে চাচ্ছেন; সেখানে তাঁর কথা অতলান্তিকের মতন গম্ভীর নয়, বরং ক্ষ্যাপা ও উদ্‌ভ্রান্ত। এটিকে যারা ধিক্কার দেন, তাদের কাছে কবির উত্তর — বিধাতার চতুর্মুখের প্রথম মুখে দর্শনের বাণী, দ্বিতীয়টিতে বেদের ধ্বনি এবং তৃতীয়টিতে কবিতার দ্রবণ হলেও চতুর্থটিতে বাজে কথা পাক খাওয়ায় বা পাগলামির উচ্ছ্বাসে কোনো অসামঞ্জস্য ঘটে নি। তাই কবিও একদিকে যেমন কল্পনার সৃষ্টিতে অসাধারণ; অনাসৃষ্টির সমান্তরাল ঝোঁকও তাঁর মধ্যে অল্প নয়।

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় *খাপছাড়া* রচনার সমকালীন কবির কর্মধারাকে তুলে ধরেছেন এভাবে :

> রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে পূর্বেও এইটি দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি। হালকা মনের বল্‌গাহীন লেখনীর সঙ্গে যোগ দিয়াছে তুলির লিখন, রেখার অঙ্কন। কতকগুলি খাপছাড়া কবিতা এবং তার সঙ্গে জমা হইয়াছে ছবি। [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪০১ : ৭৪]

এবং

> উপস্থিত গুরুগম্ভীর-দার্শনিক-তত্ত্ব-পূর্ণ মিল-হীন গদ্যছন্দে লেখা কবিতার মাঝে মাঝে কোথা থেকে আসছে খাপছাড়া কবিতার ঝাঁক, দায়মুক্ত মনের বল্‌গাহীন কল্পনা। সঙ্গে সঙ্গে চলছে যদৃচ্ছা খেয়ালে বুঝে না-বুঝে জেগে-দেখা স্বপ্নের বিস্ময়-সৃজন–অজস্র অভাবিত রূপ, অদ্ভুত ছবি, আশ্চর্য নক্সার লিখন। [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ : ১৭১]

খাপছাড়া-র ছড়াগুলোতে এর রচনার স্থান ও কাল উল্লেখ নেই, যা অধিকাংশ রবীন্দ্র-রচনায় সাধারণভাবে পাওয়া যায়। এর আগের বছরখানেক সময়ের অধিকাংশই কেটেছে শান্তি-নিকেতন ও কলকাতায়। বিশ্বভারতীর তহবিল সংগ্রহের জন্য কিছুটা সময় নৃত্যগীতের দল নিয়ে ছিলেন পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর, দিল্লি ও মীরাটে। শান্তিনিকেতন, কলকাতা এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ — এর মধ্যে *খাপছাড়া*-র ছড়া ও ছবি কখন তৈরি হলো, তার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি। প্রভাতকুমারের পূর্বোক্ত বিবরণ থেকেও সপ্তাহ, এমনকি মাস সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া যায় না। এর উৎসর্গপত্র ১৩৪৩-এর ভাদ্রের শুরুতে (মধ্য আগস্ট ১৯৩৬) এবং ভূমিকা ১৬ পৌষ ১৩৪৩ অর্থাৎ ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরের শেষ দিনে লেখা। *খাপছাড়া-য়* অন্তর্ভুক্ত ২৬টি ছড়ার পাণ্ডুলিপি রয়েছে রবীন্দ্রভবনে, "খাপছাড়া-গুচ্ছ (মুকুলের জন্য)"[৩] এই অভিধায়। এগুলোতে সম্ভবত তারিখ নেই। তবে একটি ছড়া (৯২.) বাদামি রঙের একটি চিঠির খামের উল্টোদিকে লেখা; সেখানে ডাকবিভাগের সিলমোহর রয়েছে — Sept. 36 [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩১৯]। তাহলে কী বলা যায় যে অন্তত ৯২ সংখ্যক পর্যন্ত ছড়াগুলো ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে লেখা। দুটো ইলাস্ট্রেশনে মাত্র তারিখ রয়েছে — ২ সংখ্যক ছড়ায় ৬ নভেম্বর, ১৯৩৬; ৬ সংখ্যক ছড়ায় ১৬ নভেম্বর ১৯৩৬। *খাপছাড়া*-র প্রকাশকাল ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারি ধরলেও এর ছবি সে সময়ের মুদ্রণ প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে ১৯৩৬-এর মধ্যেই আঁকা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। এসব পারিপার্শ্বিক তথ্যের ভিত্তিতে ছড়াগুলো মূলত ১৯৩৬-এর দ্বিতীয়ার্ধের রচনা বলে বিবেচিত হতে পারে।

খ.

১৩৪৩ সনের মাঘ মাসে প্রকাশিত *খাপছাড়া*-য় সংকলিত মোট ছড়ার সংখ্যা ১০৫, পরে ১৩৫৩ সনে *রবীন্দ্র রচনাবলীর* ২১তম খণ্ডে এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে আরও ২৪টি ছড়া। ১৩৭২ সনে *খাপছাড়া*-র দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য রচনাবলীতে সংযোজিত ২৪টি থেকে গ্রহণ করা হয় ১৯টি; রচনাবলীর ২, ৩, ৫, ১০ ও ১১ সংখ্যক সংযোজন এতে গৃহীত হয়নি। সংযোজনের রচনাগুলি *ছন্দ* (১৩৪৩), *প্রহাসিনী* (১৩৪৫) ও *চিত্রবিচিত্র* (১৩৬১) গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া। *খাপছাড়া*-র ৬ সংখ্যক ছড়ার

ক, খ, গ — ৩টি অংশ। এছাড়া ৮২ সংখ্যক ছড়ার ৪টি, ৯৪ সংখ্যক ছড়ার ৩টি এবং সংযোজনের ৪ সংখ্যক ছড়ার ২টি অন্য পাঠ রয়েছে। এ হিসেবে সংযোজনসহ *খাপছাড়া* থেকে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংখ্যা ১৪০। গ্রন্থের সকল রচনাই সংগৃহীত লোকছড়ার মতন শিরোনামহীন[৪]।

১৫টি তিনরঙা হাফটোন ছবিসহ ১০৯টি ছবি সংযোজন করে এ-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ছড়াকারের পাশাপাশি ইলাস্ট্রেটর হিসেবেও আবির্ভূত হন। এর বেশ কিছু ইলাস্ট্রেশন রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ছবি থেকেও নেওয়া হয়েছে। এর আগে অবশ্য তিনি *বিচিত্রিতা* (১৩৪০)-র জন্য ৭টি ইলাস্ট্রেশন[৫] করেছিলেন।

খাপছাড়া-র মূল ১০৫টি রচনার মধ্যে কয়েকটি কবিতা বিবেচনায় উৎকৃষ্ট হলেও ছড়ার সীমানা অতিক্রম করে গেছে। দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতি ও ভিন্ন ভঙ্গি বা মেজাজ এবং সুসংগত গল্প-বলার প্রয়াস এর মূল বৈপরীত্য। যেমন :

১৫. স্বপ্নে দেখি নৌকো আমার / নদীর ঘাটে বাঁধা; ...
৪৬. 'সময় চলেই যায়' / নিত্য এ নালিশে...
৫১. বাদশার মুখখানা / গুরুতর গম্ভীর,...
৫৮. সর্দিকে সোজাসুজি/সর্দি ব'লেই বুঝি...
৭২. বেদনায় সারা মন/করতেছে টনটন্...
৯২. খড়দয়ে যেতে যদি সোজা এস খুল্না...
১০৫. স্বপ্ন হঠাৎ উঠল রাতে...প্রভৃতি।

তবে এরকম কয়েকটি বাদ দিলে *খাপছাড়া*-র অধিকাংশ রচনা আঙ্গিক ও বিষয়ের বিবেচনায় খাঁটি ছড়া। নন্‌সেন্‌স, বিষয় ও ভাষার সমন্বয়ে কৌতুক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যঙ্গ, কোথাও তির্যকতা, কোথাও আকস্মিকতা ও বিস্ময় নিয়ে এ-গ্রন্থেই পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের বহু সংখ্যক শুদ্ধ আঙ্গিকের ছড়া। যেমন নন্‌সেন্‌স :

১. ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
    পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়-
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
    হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহাসিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
    রেখে দেয় খোলা জালনায় —
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
    চুন দেয় তারা ডালনায়।

২৪. বর এসেছে বীরের ছাঁদে
    বিয়ের লগ্ন আটটা —
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
    গালেতে গালপাট্টা।

শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে,
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয় — 'ঠাট্টা'।

৭৭. ইয়ারিং ছিল তার দু কানেই।
গেল যবে স্যাকরার দোকানেই
মনে প'ল — গয়না তো চাওয়া যায়,
আরেকটা কান কোথা পাওয়া যায়
সে কথাটা নোটবুকে টোকা নেই।[৬]
মাসি বলে, 'তোর মতো বোকা নেই।'

এই নন্‌সেন্‌সের কার্যকারণসূত্র ও যুক্তিসংগতি একান্তই নন্‌সেন্‌সের নিজস্ব, যাকে বলা যেতে পারে অপ্রকৃতিস্থ যুক্তি। অনেকে এটাকে বর্ণনা করেছেন পরাবাস্তব আনন্দমেলার হাস্যময় ক্রীড়াকৌতুক রূপে [CUDDON ১৯৮৬ : ৪২৬]। মানুষের ঔচিত্যহীন কার্যকলাপের ক্রমবর্ধমানতার প্রতিক্রিয়ায় এর উদ্ভব। পৃথিবীতে কোনো মানুষের জীবনযাপন যখন উদ্দেশ্য ও অর্থহীন হয়ে পড়ে, তখন উপহাস ছাড়া তার জন্য আর কিছুই প্রাপ্তি থাকে না। এমন ধরনের একদল মানুষের মুখচ্ছবি নিবিড় শিল্পসংযমের মধ্যে ফুটে উঠেছে *খাপছাড়া*-য়। এই নন্‌সেন্‌সের মধ্য দিয়ে মানুষ তার পারিপার্শ্বিকের অনেক চেনা জিনিসকে নতুন চোখে দেখে আশ্চর্য হয়। গতানুগতিক সংজ্ঞার্থ কিংবা চিন্তাধারায় স্বকীয়তার অতিমাত্রার প্রতিক্রিয়া প্রায়ই নন্‌সেন্‌সকে ডেকে আনে। জি.কে. চেস্‌টারটন অবশ্য তাঁর *A Defence of Nonsense*-এ বলেছেন [CUDDON ১৯৮৬ : ৪২৮] যে, সত্য যেমন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অন্তঃপ্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটন করে, নন্‌সেন্‌সও তির্যকভাবে তাই করে। অবশ্য বিশ শতকে কমেডিয়ানদের হাতে পড়ে পাশ্চাত্যে এই নন্‌সেন্‌স ক্রমশ অবজ্ঞা ও ঘৃণার অন্ধকারের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের নন্‌সেন্‌সের মধ্যেও আমরা একদল মানুষের দেখা পাই যারা তাদের সমাজ ও সময়ে হাস্যাস্পদ। ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির পাঁচ বোন, মতিলাল নন্দী, গণেশ ধুরন্ধর, অতুল খুড়ো, রোগা ফণী আর মোটা পঞ্চি, নরহরি শর্মা, বীরের ছাঁদে আসা বর, গুপ্তিপাড়ার গুপি, কুজোঁ তিনকড়ি, গোপেন্দ্র মুস্তফি, ভোলানাথ, নেয়ামত দর্জি– যুক্তিসংগতিহীন আচরণ ও চরিত্রের জন্য এরা পরিহাসাস্পদ। মানুষ, মানবচরিত্র বা তার কার্যকলাপ নিয়ে এ-ধরনের পরিহাসের মাধ্যমে হেয় করা অবশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্য কোনো ধারায় অত্যন্ত অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু যুক্তিসংগতিবিহীন আচরণের মধ্যেও এই চরিত্রগুলো কী আমাদের প্রচলিত বাঁধাধরা নিয়মের রাজ্য, সমাজ, পরিবার, প্রথা, নীতি, উচিত-অনুচিতকে পরিহাসাস্পদ করে তোলে নি?

শুদ্ধসত্ত্ব বসু অবশ্য *খাপছাড়া*-র নন্‌সেন্‌স নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন :

> এগুলিকে ঠিক 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের সগোত্র বা Nonsense verse বলা যায় না, খাপছাড়া একরকমের উদ্ভট বই বলা চলে। পারম্পর্যহীন অসংলগ্ন আতিশয্য নিয়ে কাব্যের নিয়মতান্ত্রিক ঔচিত্য রক্ষা করে এ এক নতুন ধরনের বিশেষ সৃষ্টি। সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভট শ্লোকের সঙ্গে গোত্রগত মিল খুঁজলে হয়তো একটা ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্র বের করা চলে — তাও শুধু আয়তনের দিক থেকে। [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৪০৬ : ২২৯]

সুকান্ত চৌধুরীও নন্‌সেন্‌স কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়ের তুলনা করতে গিয়ে [প্রণতি মুখোপাধ্যায় ১৯৮৮ : ১৫২, ১৫৩, ১৫৬] দেখিয়েছেন যে, "নিছক উদ্দেশ্যহীন উদ্ভট কল্পনায় মাততে রবীন্দ্রনাথের যেন একটু বাধে"; ফলে "অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কবির উদ্ভট কল্পনাও ঠিক যুক্তি বা বাস্তববুদ্ধির জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে" পারে না। মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ "খাপছাড়া জগৎকেও যথার্থ খাপছাড়া করতে রাজী নন"।

আসলে *খাপছাড়া-র* হাসি অনেকাংশেই সমালোচনা বা করুণার হাসি; রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং অসাধারণ যুক্তিসংগত জীবনযাপন ও মানসগঠন উদ্ভটত্বকেও পুরোপুরি অর্থহীন হতে দিতে পারেনি।

গ.

নন্‌সেন্‌সের পাশাপাশি *খাপছাড়া*-য় কৌতুক ও ব্যঙ্গ ছড়ার একটি সমান্তরাল ধারা বহমান। এর হাস্যরস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাগ্‌বৈদগ্ধ্যজাত হাস্যরস (wit)। ছড়ার সীমাবদ্ধ অবয়বের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করেছেন সংসার জীবন — বিশেষত পত্নীভীতি ও দাম্পত্য কলহ; রান্নার দুরবস্থা ও অতিভোজন; চোর-ডাকাতের উপদ্রব; নতুন বণিকদল ও মধ্যবিত্ত; নগরায়ণের নানা অসংগতি; ব্যক্তিনাম ও স্থান নাম; বৈজ্ঞানিক ও গবেষণাকর্ম; প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা; মানবেতর প্রাণীর মধ্যে জিরাফ, বিড়াল, মাছ ও কোলাব্যাঙ; সাগরমন্থন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে।

'মরিস ভয়ে ঘরের প্রিয়ার' (৮৩.) জাতীয় স্বামীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করেছেন একাধিক ছড়ায়। কালুর খাবার শখ পিষ্টক বা পিঠার; কিন্তু গৃহিণী যা তৈরি করেছে তা যেন ইষ্টকের ওপর চিনি মাখানো হয়েছে[৭] এবং অদৃষ্টকে গালি দিতে দিতে কালু পুড়ে কালো হওয়া সেটিকেই "ভালো" বলে ভক্ষণ করছে, "কলিক্‌-ব্যাথায়" স্মরণ করছে "ক্রুশে-বেঁধা খৃস্টকে" (২১.)। তবে দাঁয়েদের গিন্নীর স্বামীর অবস্থাটা আরও করুণ :

৭৪. ... কাঁচকলা-খোসা দিয়ে
পচা মহুয়ার ঘিয়ে
ছেঁচকি বানিয়ে আনে —
সে কেবলি পতি সয়;
একটু করলে 'উহুঁ'
যদি এক–রতি সয়!

যে-সব গৃহিণীর "সুন্দরী বলে" "খ্যাতি আছে" তারা রূপের গৌরবে রান্নায় আরও অপটু হবেন, এমন প্রচলিত ধারণা *খাপছাড়া*-তেও প্রতিফলিত। দেখা যায় (৩৪.), সুন্দরীর রান্নায় লবণ কম, পায়েসে চিনি কম, "স্বামী তবু চোখ বুজে খায়"।

মাত্র ১৯ বছরের দাম্পত্যজীবনের পর রবীন্দ্রনাথ বিপত্নীক হন ৪১ বছর বয়সে। ঠাকুরবাড়ির পরিসর বা পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের পত্নীভয়ের ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছিল কী না সন্দেহ!

তবে গৃহিণী-সংক্রান্ত সবগুলো রসিকতাই এখানে রান্নাকে কেন্দ্র করে। এর ব্যতিক্রম দেখা যায় ছন্দ-আলোচনায় (মাঘ ১৩৩৮), যখন রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ হিসেবে একটি উৎকৃষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক-উপভোগ্য ছড়া তৈরি করেন — "একটি কথা শুনিবারে তিন্‌টে রাত্রি মাটি,/এরপরে ঝগ্‌ড়া হবে, শেষে দাঁত কপাটি" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮২ : ১০১]।

বাঙালি পুরুষের যুদ্ধ মূলত ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে — বিষয়টি কবির দৃষ্টি এড়ায় নি। বলছেন, "লড়াই ভালোবাসিস, সে তো/ আছেই ঘরের ভিতরে" (৮৩.)। আবার যেসব পুরুষ গুণ্ডা দেখে ভয় পায়, দারোগা দেখে দরজা বন্ধ করে রাখে, তারা যখন ঘোষণা করে —

৬৬. বটে আমি উদ্ধত,
নই তবু ক্রুদ্ধ তো,
শুধু ঘরে মেয়েদের সাথে মোর যুদ্ধ তো।[৮]

— তখন সেসব পুরুষরাও পরিহাসের পাত্রই হয়ে ওঠে। এমনকি ডাকাতের ভয়ে যখন কর্তা ছোটবউকে রাত-জাগরণের কথা বলে (৮৯.) অথবা ডাকাতের সাড়া পেয়ে কালু যখন তাড়াতাড়ি ইজেরে মুখ লুকোয় (৮৪) তখন পাঠকের দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলালের কথাই মনে পড়া অনিবার্য।

একটি ছড়ায় (১৬.) "রোগা ফণী" আর "মোটা পঞ্চি"র মধ্যে "বউ নিয়ে ... বকাবকি" (নারী নিয়ে?)-র কথা আছে; অথচ "দুজনে না জানে এই বউ কার"! তাহলে ভাড়ার নৌকার এ-বউ কোথা থেকে এল? *খাপছাড়া*-র এই একটি ছড়ায় প্রাপ্তবয়স্ক-উপভোগ দৃষ্টিগোচর হয়, যখন "পঞ্চি চেঁচায়" এই বলে যে "পারবি নে তুই মোরে বঞ্চিতে" এবং "বউ বলে, 'বুঝে নিই দাউদাউ/ মোর তরে জ্বলে ওই কোন চিতে"। শ্মশান বা চিতা কিংবা মন বা চিত্ত, দু-অর্থেই শেষ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ।

গার্হস্থ্য বিষয়ের মধ্যে রান্না নিয়ে কৌতুক-ছড়া একাধিক। রান্না এবং খাদ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই উৎসুক ছিলেন। *বীথিকা*-র 'নিমন্ত্রণ' কবিতায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) পরলোকগতা স্ত্রীর কাছে কল্পিত পত্রে কবি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে "জেনো বাসনার সেরা বাসা রসনায়"। *প্রহাসিনী* (১৯৩৯)-র 'পরিণয়মঙ্গল'-এও বলেছেন যে 'পাক প্রণালী মতে...রন্ধন/..প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন"। *খাপছাড়া-য়* গিন্নি রান্নার আয়োজন করেছেন (১৯.) — বিধুকে বলছেন চাল-জল মেপে ডেকচি চড়াতে, সেজবউকে হাতা নিয়ে এসে রুটি বেলে দিতে ও উনুন জ্বেলে দিতে; নিজে তিনি কলাপাতা গুণবেন, রুটি সেঁকবে মহেশ। আর মহিমের শাশুড়ি জামাইষষ্ঠীর দিনেও "রাঁধবার নামে কাহিল বোধ করেন",

"দেহটা ভেসে যায় ঘামে" (২৬.)। এর সমাধান — "বেয়ানকে লিখে দেব — খাওয়াবেন তিনি"।

"পাঁচকবর গদাধর মিশ্র"-এর কুন্তল-তেল চুরি পর্যন্ত *খাপছাড়া*-র কৌতুক ছড়ার (৫৬.) বিষয় হয়েছে। ঠাকুরবাড়িতে ভৃত্যমহল ছিল পরিবারেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও শৈশব কাটিয়েছেন ভৃত্যমহলে। তাঁর কবিতা ও কথাসাহিত্যে এর ছাপ আছে যার একটি প্রকাশ *চিত্রা*-র 'পুরাতন ভৃত্য' (ফাল্গুন ১৩০১)-এ। তবে 'পুরাতন ভৃত্য' কেষ্টা আর পাঁচক গদাধর মিশ্রের রস সম্পূর্ণ আলাদা।

"শ্যালা"-"শ্যালী"র সঙ্গে ভগিনীপতির পরিহাস নিয়ে ছড়ার সংখ্যা একাধিক। একটিতে স্ত্রীর বোন শালী এবং গালি হিশেবে ব্যবহৃত শালীর দ্ব্যর্থকতায় (৬১.) জমে উঠেছে হাস্যরস। তবে কবির এ-ধরনের ছড়ায় হাস্য ও ভয়ানক রসের মিশ্রণ চোখে পড়ার মতন। এ ছড়ায় (৬১.) শ্যালী ভগিনীপতির ভৎর্সনায় আফিম খেতে বা গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করতে চায়। অন্য ছড়ায় (২৪.) ভগিনীপতির সঙ্গে "ক্রমে আলাপ...জমে" ওঠার পর গাঁট্টা খেয়ে শালীর মৃত্যু, শ্বশুরের শোক এবং ভগিনীপতি কর্তৃক বিষয়টিকে "ঠাট্টা" বলে উড়িয়ে দেওয়া এর উদাহরণ।

পোশাক নিয়ে ঠাট্টা আছে অন্তত ৬টি ছড়ায়। একটিতে "কানে কলম গোজা" অতুল খুড়ো চোখ টিপে "বললে হঠাৎ" "পরতে হবে মোজা"; ফল ঘরসুদ্ধ লোকের অকারণ হাসি (১৪.)। একটিতে বৈষ্ণব গুপি "কাছা কোঁচা ঘুচিয়ে" "ধরল ইজের, পরল টুপি" (৩১.)। গোপেন্দ্র মুস্তফিও রঙিন টুপি পরল, তবে তা পায়ে; মাথায় জুতো (৩৮.)। দস্তানার অতি মূল্যের কথাও আছে (৪৪.)। পোশাক নিয়ে ব্যঙ্গের চরম প্রকাশ নীলুবাবু যখন নিয়ামৎ দর্জিকে জানিয়ে দেয়–

৯৩. 'পুরানো ফ্যাশানটাতে
নয় মোর মর্জি।'
শুনে নিয়ামৎ মিঞা[৯] যতনে পঁচিশটে
সম্মুখে ছিদ্র, বোতাম দিল পৃষ্ঠে।'

নীলু তাতে 'আশ্চর্যি!' হলো, গৃহিণী "ধর্যি" হারালেন। এসবের মধ্যে কী বাঙালির পাশ্চাত্য পোশাক গ্রহণ করার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরক্তি বা কোনো বিরূপতার প্রকাশ আছে? কিন্তু বাঙালির আধুনিক পোশাক তো অনেক পরিমাণে ঠাকুরবাড়িরই অবদান! রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য কৈশোরের পর পশ্চিমা পোশাক তেমন পরেন নি; অন্তত আলোকচিত্রের সাক্ষ্যে তাই মনে হয়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের দ্রুত বিকাশমান নগর। কিন্তু এই নগরজীবন বা নগরায়ণকে রবীন্দ্রনাথ কখনো অনুকূল দৃষ্টিতে দেখেননি। "ইটের পরে ইট/ মধ্যে মানুষ কীট"-এর জীবন কবির ভালো লাগে নি। তাই প্রকাশ্যেই দাবি করেছেন "দাও ফিরে সে অরণ্য/লও এ নগর"। কৌতুকের মধ্যেও কবির নগর-বিমুখতা স্পষ্ট :

৮১. যখন জলের কল
হয়েছিল পলতায়
সাহেবে জানালো খুদু,
ভরে দেবে জল তায়।
ঘড়াগুলি পেত যদি
শহরে বহাত নদী, ...

এই বিকাশমান নগরের কলুটোলায় নতুন মধ্যবিত্ত চাকুরি করতে আসে কাহালগাঁও থেকে। পথে ঘোড়ার গাড়ির লাগাম ফেঁসে গেলে "দেরি হয়ে গেল ব'লে/ ভয়ে মরে কাঁপি সে —" (৬৫.)। কারণ অফিসে "নাম ছাঁটার" ভয় আছে (৭০.); নড়বড়ে চাকুরি, কেননা "কাজ যদি জুটে যায়/দুদিনে তা ছুটে যায়, (৭৩.)। চাকুরি হারিয়ে মধ্যবিত্ত ক্রমশ নিঃস্ব হতে থাকে। প্রথমে "স্ত্রীর শাড়ি নিজে পড়ে/স্ত্রী... গামছাটা" (৭০.)। বিলাস-সামগ্রী থেকে টিনের চায়ের চামচ পর্যন্ত বিক্রির চেষ্টা চলে; বৈরাগী হওয়া ছাড়া পথ থাকে না। কেউবা মামলাতে হয় নিঃস্ব (২৫.)। এরই মধ্যে নতুন বণিকরা সুদের ব্যবসায় "মুনাফার মাত্রা" বাড়ায় (৭১.)। ভাগ্যবান কেউ লটারিতে পেয়ে যায় "হাজার পঁচাত্তর" টাকা (৭৮.); স্তাবকের দল জুটতেও সময় লাগে না। আবার জিতুর মতো কোনো অডিটর বাকিতে গাড়ি কিনে (২৮.) দাম শোধ করতে পারে না; দোকানি জারি করে ডিক্রি।

"কুঁজো তিনকড়ি" (৩৬.) সকাল-সন্ধ্যা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে "চারদিক্কার...পাড়া" ঘুরে। সিধু "রাগে দাঁত কড়মড়ি" এজন্য তাকে ধিক্কার দেয় এবং এ-শিক্ষাদানের "মাহিনা" হিসেবে ঝুলির সম্পদ আত্মসাৎ করে নেয়। পরজীবী বাঙালি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ে এ-কৌতুক অসাধারণ। "নওগাঁর তিনকড়ি" অবশ্য চলে "ঘরে ঘরে ঋণ করি" (১০.) — কর্মঅলস বাঙালির প্রতিচ্ছবি ওটি।

"সিঁধ-কাটা" চোরকে উত্তম-মধ্যম দেওয়ার ঘটনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কৌতুক করেন, তাতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুদ্রাপ্রবাহের তত্ত্বই যেন পরিহাসের বিষয় হয়ে ওঠে :

৬৯. ... তোমার পকেটটাকে করেছ কি ডোবা হে —
চিরদিন বহমান অর্থের প্রবাহে
বাধা দেবে অপরের পকেটটি পূরতে?
....
ওর কাছে অর্থ-নীতিটা নয় জেনানা;
বদ্ধ ধনেরে তাই দেয় সদা ঘুরতে,
হেথা হতে হোথা তারে চালায় মুহূর্তে।

পুঁজিবাদী সমাজের ধনসঞ্চয় রবীন্দ্রনাথের নিরর্থক মনে হয়েছিল। এ-ধন যে লক্ষ্মীর কল্যাণ নয়, কুবেরের ধনস্তূপ; *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি*-তে তা খোলাখুলিই বলেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ধনতন্ত্রের অবাধ গতিপ্রবাহে বিশ্বাসী ছিলেন না। অন্য একটি ছড়ায় (৭৯.) টাকার মান ও নোটের সংখ্যায় চিন্তাহরণ দালালের কাছে ঠকে যে কৌতুককর অবস্থা, তাও অর্থনীতির মারপ্যাঁচ নিয়ে একরকম রসিকতার প্রকাশ।

"নাম তার" বলে মানুষের নাম ও স্থাননামকে ভিত্তি করে কৌতুক করেছেন কয়েকটি ছড়ায়। কবি যখন "ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরথ" (৪০.)-এর ফাটা তাম্বুরা নিয়ে নিরর্থ "সুর-বোধ-সাধনায়" ধ্রুপদী চর্চায় পাড়ার লোকের ধৈর্য হারানোর কথা বা "চিনুলাল হরিরাম মোতিভয়" (১০৩.)-এর কৃপণতা ও ব্যবসায় অতি সতকর্তার কথা বলেন তখন অনুমান করা যায় এখানে কৌতুকের পাত্র কলকাতায় জাঁকিয়ে বসা মাড়োয়ারি-গোষ্ঠীর বণিকরা, যাদের একদল বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নানা হাস্যকর কাণ্ড করছে। শুধু নাম নিয়ে খেলার কৌতুকও আছে :

৩৮. সন্ধেবেলায় বন্ধুঘরে
জুটল চুপি চুপি
গোপেন্দ্র মুস্তফি।[১০]

স্থাননাম নিয়েও কৌতুক আছে; একটি ছড়ার পুরো অবয়বটিই গড়ে তোলা হয়েছে হাজারিবাগ, ময়মনসিংহ, শেয়ালদহ, হাতিবাগান, গিরিডি, মহিশূর প্রভৃতি দিয়ে (১০৪.)। অন্য একটিতে (১৭.) বর্মা, খণ্ডালা, অণ্ডাল, কোডর্মা। একটি ছড়ায় (৬২.) শ্রীলঙ্কা নিয়ে কৌতুক আছে। তবে ব্যক্তিনাম ও স্থাননামের সমকেন্দ্রিকতায় নিম্নোক্ত ছড়াটি অনন্যসাধারণ–

৪৩. আদর ক'রে মেয়ের নাম রেখেছে ক্যালিফর্নিয়া,
গরম হল বিয়ের হাট ঐ মেয়েরই দর নিয়া।
মহেশদাদা খুঁজিয়া গ্রামে গ্রামে
পেয়েছে ছেলে ম্যাসাচুসেট্স্ নামে,
শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুশি নামজাদা সে বর নিয়া —
ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে নামের গুণ বর্ণিয়া।

তবে স্থাননাম নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের এই একটি ছড়াতেই পাশ্চাত্য নগরের বা রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। বিরামহীন যাত্রী রবীন্দ্রনাথ মোট ১৪ বার দূরপ্রাচ্য, ইন্দোচীন, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। বঙ্গের বহু গ্রাম, জনপদ ও নগরে আতিথ্য নিয়েছেন। ঘুরেছেন সে সময়ের বৃহত্তর ভারতবর্ষের নগরে-বন্দরে। তবে তার স্থাননামের ছড়া মূলত বঙ্গের বিভিন্ন স্থাননাম এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

স্বাস্থ্য-উদ্ধার বা বায়ুপরিবর্তনের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর রুগ্ন কিশোর পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় গেছেন। কবি নিজে বৃহত্তর বঙ্গের মধ্যেও নানা জায়গায় মাসের পর মাস বাস করেছেন। এমন কি শান্তিনিকেতন বা কলকাতায়ও বাসা বদলেছেন বার বার। তাহলে নিচের ছড়াটি কি আত্মকৌতুক?

৮৩. বাংলাদেশের মানুষ হয়ে
ছুটিতে ধাও চিতোরে,
কাঁচড়াপাড়ার জলহাওয়াটা
লাগল এতই তিতো রে?

একটি ছড়ায় (৮৬.) "শর্মা বাণেশ্বর"কে পাওয়া যায়, "গাইয়ের কাজ নিতে" "বরাবর" "গাজ্‌নিতে" গিয়ে "পাঠানের ভাব দেখে/ভাঙিল গানের স্বর"।[১১]

বিজ্ঞানের গবেষণা ও বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে *খাপছাড়া*-য় বেশ কিছু কৌতুক প্রত্যক্ষ। বিজ্ঞানী অনুকূল বাবুর আবিষ্কার ঘাসে ভিটামিন রয়েছে এবং "গোরু, ভেড়া, অশ্ব" তা খেয়ে পুষ্টিলাভ করছে; গৃহিণীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও অনুকূল বাবু তাই ঘাস খাবার অভ্যাস শুরু করলেন। ব্যাপারটি আরও কৌতুকবহ হয়ে ওঠে যখন কবি বলেন :

১৮. গৃহিণী দোহাই পাড়ে মাঠে যবে চরে সে,
ঠেলা মেরে চলে যায় পায়ে যবে ধরে সে —
মানবহিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্য!

এবং ফলে —

দুদিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বিঁধে আছে এই মহা শোকটা,
বাঁচলে প্রমাণ-শেষ হ'ত যে অবশ্য।

নিদ্রা কেন মানুষের ইচ্ছে বা আদেশমত আসবে-যাবে না, এ-প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্যস্ত এম.এস্‌সি.-র "ব্রিলিয়ান্ট্ ছাত্র"। এর পরীক্ষা চালাতে সে "বাজায় পাড়ার কানে/নানাবিধ বাদ্য —" (৮৭.); কিন্তু "চোখ-চাওয়া ঘটে তাহে/নিদ্রার শ্রাদ্ধ"। আবার অঙ্ক কষে জীবনের সবকিছু ঘটে না; চুনিলাল গণিতের রিলেটিভিটি নিয়ে গবেষণা করে, কিন্তু কবি তাকে সতর্ক করে দেন — কেননা হিড়িম্বা আর কুন্তীর যোগফল নিশ্চয়ই শুধু দুই হবে না; অর্থাৎ সংখ্যাতত্ত্ব জীবনের সর্বক্ষেত্রে চলে না। অথবা —

৮৫. যতই-না ক'ষে নাও মোচা আর থোড়কে
তার গুণ-ফল নিয়ে আঁক যাবে ভড়কে।

গবেষণা নিয়ে কৌতুকের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে ডাক্তার ময়জন-এ যিনি "বাতাসে... কড়া পয়জন" ছড়িয়ে বড় আকারের এক শহরে গুণে দেখেন "টিঁকে আছে নাবালক নয়জন"। এবং —

৩৩. খুশি হয়ে ভাবে এই গবেষণা
না জানি সবার কবে হবে শোনা,
শুনিতে-বা বাকি রবে কয়জন।

কবি কি এখানে বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক আবিষ্কার আর আবিষ্কারকের উন্মাদনা নিয়ে কৌতুক করেছেন? প্রসঙ্গত, এসময়ে পারমাণবিক অস্ত্রের আবিষ্কার সম্পন্ন না হলেও অস্ত্রে পারমাণবিক পদার্থ ও রাসায়নিক ব্যবহারের মাধ্যমে এর ধ্বংসক্ষমতাকে ভয়াবহ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আর অজ্ঞাত ছিল না।

বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল সুগভীর। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর ভাষ্য : "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার"

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৬ : ভূমিকা]। কিন্তু তাঁর আপত্তি ছিল, পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবিত যন্ত্র মানুষের ওপর প্রভুত্বের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে; যান্ত্রিকতার একাধিপত্যও তাঁর ভালো লাগে নি [সত্যেন্দ্রনাথ রায় ১৩৮৯ : ১৮]। ভারতে বিজ্ঞান চর্চাকারীদের অনেকের ক্ষেত্রে তাঁর অবলোকন ছিল, বিজ্ঞান তাঁদের অন্তরে প্রবেশ করে না; কর্মক্ষেত্রে বিজ্ঞান-গবেষণা করেও জীবনচর্চায় তারা বিজ্ঞানবিরোধী [সত্যেন্দ্রনাথ রায় ১৩৮৯ : ১৭৯]। বিজ্ঞানের সারবস্তুকে অনুধাবন না করে এর যান্ত্রিক প্রয়োগ কত হাস্যকর হতে পারে অথবা বিজ্ঞানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রের একচ্ছত্র ও একমাত্র প্রভু মনে করলে যে পরিণতি হতে পারে, তার প্রতিফলন রয়েছে এ-সব কৌতুকের মধ্যে।

আর এই কৌতুকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় পুরাণ ও বিশ্বাসকে পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন, যখন পৌরাণিক সাগরমন্থনের ঘটনা যাচাই করতে বম্বাই বন্দর ইজারা নিয়ে ইতিহাসবিশারদ গণেশ ধুরন্ধর —

১৩. নিয়ে সাতজন জেলে
দেখে মাপকাঠি ফেলে —
সাগরমথনে কোথা উঠেছিল চন্দর,
কোথা ডুব দিয়ে আছে ডানাকাটা মন্দর।

যদিও *পল্লীপ্রকৃতি* প্রভৃতি গ্রন্থে কবি সমুদ্রমন্থনের উপমা ব্যবহার করেছেন, তবে পুরাণের সব ঘটনায় বা বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না। *The Religion of Man (১৯৩১)*-এ তিনি পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, "I refused to accept any religious teaching merely because people of my surrounding belived it to be true.'' [Sishir Kumar Das ১৯৯৬ : ১২০]। ফলে আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতে, এ পর্বে এসে "বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর ধর্মচিন্তার সংঘাত বাধলো" [আবু সয়ীদ আইয়ুব ১৯৯৭ : ১৪১]। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে এক চিঠিতে[১২] কবি লিখেছিলেন যে, "অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে" [সত্যেন্দ্রনাথ রায় ১৩৮৯ : ১৭৯]।

সে-সময়ের প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আস্থা ছিল না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। নিজেকে তিনি বর্ণনা করতেন "ইস্কুলপালানো ছেলে" রূপে। কবির মতোই *খাপছাড়া*-র মতিলাল নন্দীর স্কুলে পড়া এগোয় না। অবশেষে —

৩. শেষকালে একদিন গেল চড়ি টঙ্গায়,
পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাসালো মা-গঙ্গায়।
সমাস এগিয়ে গেল,
ভেসে গেল সন্ধি ...

রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে, পণ্ডিত তারাই যারা সবকিছু পণ্ড করে দেয়। *খাপছাড়া*-র হরপণ্ডিত মনুকে ব্যঞ্জন-সন্ধি শেখানোর চেষ্টা করে, কিন্তু মনুর মন হেঁশেলের "ব্যঞ্জন-চিন্তায় অস্থির"; সে-দুঃখে তাঁর "চক্ষুর কোণ দিয়ে" "থেকে থেকে জল পড়ে" (৯৫.)। ব্যঞ্জন শব্দের দ্ব্যর্থকতা এখানে কৌতুককে আরও ঘনীভূত করেছে।

ঘ.

কৌতুক যখন ঝাঁঝালো হয় — বিদ্রূপ, শ্লেষ, কটাক্ষ প্রবল হয়ে ওঠে তখন ব্যঙ্গছড়ার লক্ষণগুলো স্পষ্টতর হয়। *খাপছাড়া*-র বেশ কিছু ছড়ায় ব্যঙ্গের লক্ষণ প্রত্যক্ষ। এর একটি অংশের ব্যঙ্গের পাত্র সামন্তগোষ্ঠী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কর্মজীবনে শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদারির কাজে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং সামন্ত-প্রভুদের ব্যঙ্গ করা এক্ষেত্রে আপাতবিরোধ (paradox) বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ঠাকুর পরিবারের জমিদারি মধ্যযুগীয় মোগল বা নবাবদের আমলের উত্তরাধিকার নয়; এটি বণিকপুঁজিতে গড়ে তোলা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন ভূমি বা রাজস্বব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। জমিদারি-প্রথা নিয়ে কবির মনের মধ্যে যে দ্বিধা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৩০ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখছেন : "জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা হয়।" পত্রবধু প্রতিমা দেবীকে লিখেছেন : "বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদেরই প্রজাদের হয়, আমরা যেন ট্রাস্টির মত থাকি"। প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন : "আমার তো সবচেয়ে দুঃখ হয় এই জন্য যে প্রজাদের জন্য লোকসান করার পূর্ণ অধিকার আমার হাতে নেই"। ব্যক্তিগত জীবনাচরণেও রবীন্দ্রনাথ যতটা জমিদার-স্বভাবের ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন গুরু-স্বভাবের। প্রমথ চৌধুরীর *রায়তের কথা*-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "আমার জন্মগত পেশা জমিদারী কিন্তু স্বভাবগত পেশা আসমানদারী"।

ইতিহাসে দেখা যায়, পলাশির যুদ্ধের (১৭৫৭) আগে থেকেই মোগল ও নবাবদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সামন্তরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫) পর তাঁরা শাসন ও রাজস্ব আদায় — উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁদের অনেকেই পুরানো বিত্তের অবশেষ নিয়ে নবাবি ঠাঁটে চলতে থাকেন, যার অন্তঃসারশূন্যতা উন্মোচিত হয়েছে *খাপছাড়া*-র কয়েকটি ছড়ায়।

রাজা ধ্যানে বসেছেন শুনলেই বোঝা যায়, রাজকার্য তার নেই (২২.)। কিন্তু সঙ্গে "বিশজন সর্দার" আছে "খবরদার" রবে চীৎকারের জন্য। "ঢাকঢোল-বর্দার" নিয়ে "সেনাপতি ডাক ছাড়ে/মন্ত্রী সে দাড়ি নাড়ে", রানীরা পর্দার আড়ালে মূর্ছা যায়। অন্য ছড়ায় সুলতান সভাতলেই "কাৎ হয়ে শুয়ে" নাক ডেকে ঘুমান। মন্ত্রী "পাকা দাড়ি নেড়ে" গলা ছেড়ে মূলতান-এ গান ধরেন। সে উৎসাহে সেনাপতি —

৩৯. কোমরেতে এক ওড়না জড়িয়ে
নেচে করে সভা গুল্‌তান।

আর বরকন্দাজ সব কাজ ফেলে ভুল তানে বাঁশি বাজাতে থাকে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিত্ত-বৈভব আরও কমতে থাকে। তাই অন্য ছড়ায় রাজা যখন ৪ ঘোড়ার তাঞ্জামে চড়ে গাঞ্জামে রওনা দেন, তখন হলদিঘাট পৌছুতেই ৩ ঘোড়ার মৃত্যু হয়। বাকি একটি —

৪৫. গরানহাটায় পৌছে সেটা
মুটের ঘাড়ে চড়ল।

এভাবে কাঁচড়াপাড়ার রাজপুত্তুর (৪.) নওগাঁর তিনকড়ি (১০.)-রা ক্রমশ বিত্তহীন ও হাস্যাস্পদ হতে থাকেন। ফলে ফটকের ঘড়ি (৪১.) ভাঙা দেয়াল আর ইটের গাদার নিচে চাপা পড়ে, ইট-সুরকির অবশেষের মধ্যে অবলুপ্ত প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া যায়; গড়গড়ির বদলে "ফাটা হুঁকো" হাতে পদচারণাই অবশিষ্ট থাকে। পরিণতিতে রাজার জন্য তৈরি "ছাগলের কোরমাতে.. তেলাপোকা" পাওয়া যায় (৫৩.) এবং শেষ পর্যন্ত বাদশাহ নিজেকেই "হসনীয়" (৫১.) বলে ঘোষণা করেন। এই সামন্তদের অসহায়ত্বের চরম প্রকাশ ঘটে যখন —

৮২. মহারাজ ভয়ে থাকে
পুলিসের থানাতে,
আইন বানায় যত
পারে না তা মানাতে। ...

একটি ছড়ায় গব্বুরাজাকে পাওয়া যায় (৫৩.); চালাক মন্ত্রীর কথা আছে, নাম নেই। 'হিং টং ছট্' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) ও 'জুতা-আবিষ্কার' (১৩০৪)-এ অবশ্য রাজার নাম হবু, মন্ত্রীই গবু/গোবু। অন্য একটি ছড়ায় নেপালের রাজা গোলকুণ্ডার উল্লেখ (৫৬.) আছে।

অন্য একটি প্রশ্নও এখানে প্রাসঙ্গিক। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সামন্তপ্রভুর অভিজ্ঞতা কী শুধু বাংলা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল? কেননা জীবনে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বহু রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। বিশেষত *খাপছাড়া* রচনার সমকালে নৃত্যগীতের দল নিয়ে ভ্রমণ করেছেন লাহোর, দিল্লী, এলাহাবাদ, পাটনা ইত্যাদি অঞ্চল, যেখানে পুরানো রাজা-নবাবদের উত্তরপুরুষেরা বাস করতেন। অন্যদিকে শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সুহৃদদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরা-অধিপতিসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-মহারাজারা। তাঁরা তার ব্যঙ্গের লক্ষ্য হবার কথা নয়। মনে হয়, মোগল ও নবাবদের সময়ের সামন্তপ্রভুরা — উনিশ-বিশ শতকে যারা ক্ষমতা ও বিত্তহীন, তাদের মুখচ্ছবিই আছে *খাপছাড়া*-য়।

সামন্তদের পাশাপাশি ধর্মকর্তাদের অবস্থাও করুণ হয়ে আসছিল। তাই "ব্রাহ্মণ" "চাটুর্জে"র ভার বইবার মতো সক্ষম ঘোড়া তাদের আর থাকল না। পরিণতিতে চাটুর্জে "খোঁড়া ঘোড়া" থেকে পড়ে হাঁটু ভাঙেন; ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে তার টাট্টু ঘোড়াও ঠাট্টার পাত্র হয় (৬৪.)।

বৈষ্ণব কবিতা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল, সে-হিসেবে বৈষ্ণবদের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু ভেকধারী বৈষ্ণবদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে *খাপছাড়া*-য়। "গোরা বোষ্টমবাবা" বেণু নাম নিয়ে টেরিটি বাজারে অবস্থান নিয়েছে; কৌটায় করে পদরেণু বিক্রি করলেও সে —

১২. শুদ্ধ নিয়ম-মতে
মুরগিরে পালিয়া
গঙ্গাজলের যোগে
রাঁধে তার কালিয়া —
মুখে জল আসে তার
চরে যবে ধেনু।

গুপ্তিপাড়ার গুপি "কাছা কোঁচা" ছেড়ে ইজের-টুপি ধরেছে (৩১.), দুহাতে "কোফতা-কাবাব" ধ্বংস করছে — এ দৃশ্যও সম্ভবত ভেকধারী বৈষ্ণবদের প্রতি কটাক্ষ। অন্য ছড়ায়ও (৩৭.) জীবে দয়ার নামে মুরগি ভক্ষকদের মুরগি-পাখির প্রতি "অন্তরে টান"-এর কথা বলে রবীন্দ্রনাথ ভোজনে আমিষ ত্যাগীদের ঠাট্টা করেছেন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ বরাবরই "ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন"-এর সমালোচক ছিলেন।

সামাজিক রীতির মধ্যে কন্যেপণ-প্রথায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ক্ষোভ ছিল। 'হৈমন্তী' ও আরও কিছু গল্পে এর করুণ পরিণতির চিত্র তিনি এঁকেছেন। *খাপছাড়া*-তে "ঝিনেদার জ্ঞানদার ছেলেটার জন্যে" কন্যে পাওয়া গেল "ত্রিচিনাপল্লী গিয়ে" (৯৬.); নিখুঁত নাক চোখ তার, তবে "চুলের ডগার খুঁত" আছে। কন্যেকর্তা "ভরি-কয় পণ" দিয়ে ঘটকের সাহায্যে পাত্র ধরে রাখতে চান। অন্য ছড়ায় (৪৯.) বিয়ের পাকাকথার যাত্রীদের বর্ণনায় অন্যদের সঙ্গে "সই-বাহিক"ও যাচ্ছেন পণের টাকা পাকা করার জন্য। কিন্তু "পণের আশে চাকরি" ত্যাগী হীরুর বিপদ ঘটেছে–

৪৮. হেনকালে বিনা কোনো কসুরে
যম এসে ঘা দিয়েছে শ্বশুরে,
কনেও বাকালো মুখ —
বুকে তাই বেজেছে।
বরবেশ ছেড়ে হীরু
দরবেশ সেজেছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, ৭ সংখ্যক ছড়ায় বধূনির্যাতনের প্রতিফলন আছে [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩১০]; নইলে হাস্যরসের মধ্যে এমন হিংস্রতা বা বীভৎসতা থাকত না।

ডাক্তারদের প্রতি, বিশেষত অ্যালোপেথিক ডাক্তারিশাস্ত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একরকমের অনীহার পরিচয় পাওয়া যায় নানাভাবে। কবি নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন এবং শেষজীবনে বায়োকেমিকের দিকে ঝুঁকেছিলেন। রামগড়সহ নানা জায়গায় রোগীরা কবির কাছ থেকে ভিড় করে ঔষধ নিতেন, এমন বিবরণ রবীন্দ্রজীবনীতে পাওয়া যায়।

খাপছাড়া-য় মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত এক রোগী ডাক্তারের শরণাপন্ন। সুযোগ বুঝে —

৫০. ডাক্তারেরা লুটল কড়ি,
খাওয়ায় জোলাপ, খাওয়ায় বড়ি,
অবশেষে বাঁচল না সেই
বয়স যখন একাশি।

অন্য ছড়ার (৫২.) দেখি, বিধবা পিসির মৃত্যু হয়েছে; ছড়াকারের মতে সে মৃত্যুতে "বদ্দি স্বয়ং করেছে তার/সাহায্য।" "অতি উঁচু নাক" বিশিষ্ট "নাড়ীটেপা ডাক্তার"-এ ব্যঙ্গ আরও প্রত্যক্ষ (৭৬.)। তার লেখায় ঔষধের নাম পড়া যায় না যা ডাক্তারদের অস্পষ্ট হাতের লেখা সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য; নাড়ী দেখতে দেখতে পাওনা আদায়ের অবসর পাওয়াও দায়, এবং পরিণতিতে ঝাঁক ঝাঁক রোগীর যাত্রা "নির্বাক্‌পুরে।"

প্রকৌশলী নিয়ে ব্যঙ্গ আছে একটি ছড়ায়। "ডিসট্রিক্ট্ বোর্ডের সব চেয়ে সীনিয়ার" বড়ো এন্‌জিনিয়ার" "ব্রিজটার প্ল্যান দিল"। "নতুন রকম প্ল্যান", ফলে "দেখে সবে অজ্ঞান"। কিন্তু —

৬০. ব্রিজখানা গেল শেষে
কোন্ অঘটন দেশে
তার সাথে গেছে ভেসে
ন হাজার গিনি আর।

মনে হয়, পাশ্চাত্য প্রকৌশলের অবিকল নকল, যা অনেক সময় আমাদের পরিস্থিতি-পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না — সেটি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। এতে যে অর্থের অপচয় হতো তারও ইঙ্গিত রয়েছে ছড়ায়।

জনসমর্থনহীন রাজনীতিবিদের প্রতিকৃতি পাওয়া যায় ঘোষালের মধ্যে (৩৫.)। "মাতৃভূমির লাগি" "পাড়া ঘুরে মরে" "নিজহাতে" "একশো টিকিট বিলি" করেছে। কিন্তু শ'জনের মধ্যে "শুধু নিরেনব্বই" জনই অনুপস্থিত; অগত্যা "বেঞ্চি চৌকি আদি" শ্রোতার আসন নিয়েছে।

স্কুল পণ্ডিতদের প্রতি, বিশেষত শিক্ষাদানের নামে জবরদস্তি ও শাস্তি দানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ব্যঙ্গছড়াতেও স্পষ্ট। পণ্ডিত কুমিরকে যখন উপদেশ দেন নখ কাটতে এবং নিরামিষ খেতে; কেননা তাহলে কুমিরের "হিংস্র স্বভাব তবে/হবে পরিবর্তন" — তখন পণ্ডিত নিজেকেই হাস্যাস্পদ করে তোলেন। অন্য ছড়ায় (৯৮.) আক্রমণ আরও তীব্র —

৯৮. প্রাইমারি ইস্কুলে
প্রায়-মারা পণ্ডিত
সব কাজ ফেলে রেখে
ছেলে করে দণ্ডিত।
নাকে খত দিয়ে দিয়ে
ক্ষয়ে গেল যত নাক,
কথা-শোনাবার পথ
টেনে টেনে করে ফাঁক।
ক্লাসে যত কান ছিল
সব হল খণ্ডিত —
বেঞ্চিটেঞ্চিগুলো
লণ্ডিত ভণ্ডিত।

স্কুলের এই প্রথা যে রবীন্দ্রনাথের কত অপছন্দ ছিল তার প্রমাণ, নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালের বক্তৃতায় পর্যন্ত তিনি বলছেন :

> I myself had suffered when I was young through the impediments which were inflicted upon most boys while they attended school and I have had to go the machine of education which crushes the joy and freedom of life. [Sishir Kumar Das ১৯৯৬ : ৯৬২]

অন্যত্র বলছেন : Punishment itself as though it were some bitter medicine for the liver, a regular dose of which was good for the moral health of wicked boys. ফলে যখন তিনি শিশুদের জন্য শিক্ষায়তন চালু করলেন, তখন "I never used any coersion or punishment against my unruly boys."[Sishir Kumar Das [১৯৯৬ : ৫০৬]

তিরিশের কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতানৈক্যের কথা বহুল-প্রচারিত। এদের অনেকের কবিতায় প্রচলিত কাব্যরীতিকে অস্বীকার তো বটেই; "রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারের অভীপ্সা অপ্রকট নয়" [সুকুমার সেন ২০০৭ : ২৫৯]। সমালোচক দল ও কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা একে পর্যবসিত করেন রবীন্দ্র-বিরোধিতায়, যার ফলে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক কবিতার বলয়ের পূর্ববর্তী কবি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে সমসাময়িক পাশ্চাত্য কবিতার আধুনিকতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু এর অন্ধ অনুকরণ সমর্থন করেন নি। ভিক্টোরিয়া ওকাম্‌পোকে বদলেয়ার সম্পর্কে ঠাট্টা করে বলছেন, 'furniture poet'। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় আধুনিকতার অস্তিত্বও তিনি অস্বীকার করেন। সে-সময়ের পাশ্চাত্য চিত্রকলা সম্পর্কে কবি যে-মন্তব্য করেছেন জাহাজে বসে (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫) তাতেও আধুনিক শিল্প সম্পর্কে তাঁর অভিমত স্পষ্ট :

> এতকাল ধরে এই ছবি আঁকার চার দিকে ... যে-সমস্ত প্রভূত ওস্তাদি জমে উঠেছিল আজ সকলে বুঝেছে, তার বারো আনাই অবান্তর। তা সুঠাম হতে পারে, ... মনোহর হতেও পারে, ... শক্তিসম্পদও প্রকাশ করতে পারে, অর্থাৎ ঝড়ের মেঘের মতো তার আশ্চর্য রঙের ঘটা থাকতে পারে, কিন্তু আসল যে জিনিসটা পড়েছে ঢাকা সে হচ্ছে সরল সত্যের সূর্য, যাকে স্বচ্ছ আকাশে তার আপন নির্মল মহিমায় দেখে বিশ্ব আনন্দিত হয়। [কেতকী কুশারী ডাইসন ১৯৯৭ : ৪৪১]

তিরিশোত্তর কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই বিরোধ নিয়ে অতিরঞ্জিত ধারণারও অভাব নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রত্যক্ষ সাক্ষী তাঁদের চিঠিপত্র; অমিয় চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করেছেন *সাহিত্যের পথে (১৯৩৬);* সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে *আকাশ-প্রদীপ (১৯৩৯)* উৎসর্গ করে আশা করছেন "আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে..."।

"বয়ঃকনিষ্ঠ যে সব লেখক রবীন্দ্রনাথের রচনাকে সেকেলে বলে অবজ্ঞা করছিল" [সুকুমার সেন ২০০৭ : ২২৪], *শেষের কবিতা* (১৯২৯)-য় তাদের নিয়ে কৌতুক করেছেন কবি; সেখানে আধুনিক কবির প্রতিভূ নিবারণ চক্রবর্তী হার মেনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই শরণাপন্ন। মৈত্রেয়ী দেবীর শিশুকন্যার ছড়া-শেখা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঠাট্টা এখানে স্মর্তব্য: "রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত, রবীন্দ্রোত্তর বা রবীন্‌ধুত্তোর, অনেক কিছুই তো হতে হবে আধুনিক হতে হলে,[১৩] বেচারা মুশকিলে পড়বে দেখছি।" [মৈত্রেয়ী দেবী ১৯৬৭ : ২০৪] ছড়াতে এদের প্রতি ব্যঙ্গ প্রত্যক্ষ যখন রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবির প্রতিকৃতি আঁকেন এভাবে :

২০. মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলুঢুলু
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক —
আলুথালু ভাষা, ভাব এলেমেলো,
ছন্দটা নিরবাধুনিক।

কিন্তু পাঠকরা যখন বিভ্রান্ত হয়ে বলেন, "বুঝি কি বুঝি নে যায় না সে বোঝা"; আধুনিক কবি তখন গর্ব করেন এই বলে যে —

... 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক'।

অন্য ছড়ায় (৮৮.) ব্যঙ্গের লক্ষ্য সাহিত্যের ব্যবসাবৃত্তি। যখন ঘরের আসবাবপত্র নিলাম করেও "দিন চলে না", তখন পেশা হিশেবে বেছে নেওয়া হয় গল্পের নাট্যরূপ দান। একাজে সমালোচকের নিন্দা এড়াতে তাদের জন্য "মুর্গি এবং মুর্গি আণ্ডা" সহযোগে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচকদেরও হাস্যকর করে তোলেন, যখন ওজনদার ভোজনের পর তারা এর প্রশংসাসূচক প্রত্যয়ন দেন।

অজিত দত্ত অবশ্য মনে করেন যে এটি আত্মব্যঙ্গ। তাঁর মতে, "নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবার দিকে রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ঝোঁক ছিল। এখানেও সেরূপ ব্যঙ্গের দেখা পাওয়া যায়" [অজিত দত্ত ১৯৬০ : ৩১৬]।

রবীন্দ্রনাথ যে *খাপছাড়া*-য় অসংগত মানুষগুলোর সঙ্গে আমাদের সমাজের নেতিবাচক চরিত্রের মুখচ্ছবিও আঁকছিলেন, কিছু বিশেষণ ও শব্দ-ব্যবহার থেকেও তা স্পষ্ট। কবি যখন বলেন শয়তান (৯৪.), ধূর্ত (৬৯.), ধুরন্ধর (১৩.), চতুর (৩৭.), খল (৩৭.৮১.), দালাল (৭৯.), উমেদার (৭২.) কিংবা উদ্ধত (৬৬.), দম্ভী (৫১.) বা কৃপণ/কিপটে (৪২.৭৪.) তখন এ-ধরনের মানুষের প্রতি তাঁর অসন্তোষ ও বিরক্তিই প্রকাশ পায়। অথবা যখন ফন্দি (৩.), লোভ (৯.), কারসাজি (৯.) কিংবা বন্দনা/স্তুতি (৮.); নতজানু (১০২.) ও আলাসেমি-কুড়েমি (১০. ৪/৬.)-র কথা বলেন তখনও বোঝা যায় সমাজের এ-চরিত্রের মানুষগুলো তার পছন্দ নয়।

ঙ.

খাপছাড়া-য় অন্তত দুটি রূপক-ছড়া আছে, দুটিই খাদ্য-খাদক সম্পর্ক নিয়ে। একটিতে বিড়াল ও মাছ (৯৪.), অন্যটিতে মানুষ ও মুরগি (৩৭.); দুটিতেই খল চরিত্র দাঁড় করানো হয়েছে — "শয়তান" মাছরাঙা ও "খল" শেয়াল। কেউ কেউ অবশ্য এ দুটিকে নীতিমূলক ছড়া অভিধায়ও চিহ্নিত করেছেন। ৮৩ সংখ্যক ছড়াটিকে বরং নীতিমূলক ছড়া বলা যায়; *কণিকা (১৮৯৯)*-র নীতিকবিতাগুলোর সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে।

খাপছাড়া-য় জীবজন্তু, পাখি-পতঙ্গের অধিকাংশ উল্লেখ রূপক হিসেবে অথবা সহযোগী চরিত্ররূপে। তবে একটি ছড়া (৫৫.)-র পুরো অবয়বটিই তৈরি জলচরদের নিয়ে — তিমি, চিংড়ি, ইলিস, শুশুক ইত্যাদি। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ যখনই আদিম পৃথিবীর কথা বলেন

তখন একদিকে তিনি জল ও জলজীবনের ওপর বিশেষ জোর দেন। এর পশ্চাতে হয়তো পানিতেই প্রাণের শুরুর ইতিহাসের ধারণাটি কাজ করে। অন্যদিকে, প্রায় অর্থহীন ধ্বনি সমষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন উল্লিখিত ছড়ায় গাঁ গাঁ, চিঁ চিঁ. দখিনা হাওয়ায় শাঁখের বাজনা, শুশুকের কুচ-কাওয়াজের শব্দ ইত্যাদি।

খাপছাড়া-র একটি ছড়া নন্‌সেন্‌স ও ফ্যান্‌টাসির মিশ্রণে অতুলনীয় ও ব্যতিক্রমী। সাঁড়ার ঘাসি কামার এক "মন্ত্রপড়া" খড়্‌গ্‌ তৈরি করেছে —

২৭. খাপ থেকে বেরিয়ে সে
উঠেছে অট্টহেসে;
কামার পালায় যত বলে, 'দাঁড়া
দাঁড়া।'
দিনরাত দেয় তার নাড়ীটাতে
নাড়া।

চকিতে আমাদের মনে পড়ে যায় লুই ক্যারল-এর *Alice's Adventures in Wonderland* (১৮৬৫) বা *Through the Looking Glass* (১৮৭২)-এর কিছু চরিত্র ও ঘটনার কথা। অনুত্তম ভট্টাচার্য অবশ্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে বলেছেন যে, এ-ছড়া "রূপকের আধারে আত্মবিধ্বংসী অস্ত্রনির্মাণের প্রসঙ্গ" [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২ : ৩১২]। মানুষের তৈরি অস্ত্র মানুষকেই বিনাশ করছে, এটি প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যদিও পারমাণবিক বোমা তখনও তৈরি হয়নি। *প্রান্তিক* (১৯৩৮)-এ কবি অনুভব করেছিলেন যে "নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস"।

তবে নন্‌সেন্‌স, কৌতুক, ব্যঙ্গ, রূপক, ফ্যান্‌টাসি সবকিছু ছাড়িয়ে অথবা সবটার মধ্যেই *খাপছাড়া*-য় বিশেষভাবে দৃষ্টি কাড়ে wit আর humour :

৫০. আয়না দেখেই চমকে বলে,
'মুখ যে দেখি ফ্যাকাশে,
বেশিদিন আর বাঁচব না তো'-
ভাবছে বসে একা সে।...
অবশেষে বাঁচল না সেই
বয়স যখন একাশি।

পুরো ছড়ায় তো বটেই, এমনকি কোনো কোনো চরণে অতি সংযত প্রকাশের মধ্যেও ঝলক দিয়ে *ওঠে* তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তীব্র হাস্যরস — 'গোরুহীন গোয়ালের তলাহীন গামলায়" (২৫.); "শ্রাব্য আমার ডোবে/ওদেরই অশ্রাব্যে" (৩০.); "নিমেষেই পরলোকে/গতি হল মোষটার" (৩২.); "যাদের আসার কথা/অনাগত সব্বাই" (৫৭.) ইত্যাদি। আবার মেছুয়াবাজারের ৪ পালোয়ানের চুরি করতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়া (১১৯.) বা রাত নিশীথে কাব্যচর্চার ফলে ঘরে প্রতিবেশীর আক্রমণ (৩০.)-এর চিত্রও চরম হাসির খোরাক জোগায়।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র মনে করেন যে, *খাপছাড়া*-কে "উইট এণ্ড হিউমার বলাই যেন ঠিক। আমাদের বাংলার শিশুসাহিত্যে এ ধরনের রচনা বিরল। বাস্তবিকই এ এক জাদুর খেলা।"

[খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯৬১ : ১৭৫] *খাপছাড়া*-র মধ্যে তিনি খুঁজে পান তিন ধরনের হাসি — কিছু গম্ভীর, কিছু ম্লান, কিছু সংযত।

খাপছাড়া-র ছড়াগুলোর এই হাস্যরসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন রবীন্দ্র-সমালোচকদের অনেকেই। তাঁদের বিশ্লেষণে হাস্যরসের উপাদান অন্বেষণের চেষ্টাও চোখে পড়ার মতো। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন:

> অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও পরস্পর-বিরোধী কতকগুলি উক্তির একত্র সমাবেশের উপর ইহার হাস্যরসের ভিত্তি। কোনো একটা সামান্য ঘটনার অস্বাভাবিকত্ব, ঔচিত্যহীনতা বা আতিশয্যকে কেন্দ্র করিয়া একটা ক্ষণিক হাসির হিল্লোল। কবি জাদুকরের মতো একটা ক্ষণিক ভেল্কি দেখাইতেছেন। [উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৪ : ৭২২]

সুকুমার সেনের বিশ্লেষণে এগুলিতে "অদ্ভুত-কৌতুকরস উচ্ছলিত।" [সুকুমার সেন ১৯৯৬ : ১৫৯] খনা মুখোপাধ্যায়ও মনে করেন যে, "খাপছাড়া-য় অদ্ভুত, অবাস্তব ও পরস্পর-বিরোধী উক্তির সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে"। [খনা মুখোপাধ্যায় ১৯৭৮ : ৪০০]

আশুতোষ ভট্টাচার্য *খাপছাড়া*-র অসংগতি ও উদ্ভটত্ব স্বীকার করেন: কিন্তু তাঁর আপত্তি — এ উদ্ভটত্ব সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট; "এই অসঙ্গত এবং উদ্ভট ভাব-সৃষ্টির মূলে একটি সচেতন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশীল মনের যে সযত্ন প্রয়াস আছে" তাই লোকছড়ার সরল উদ্ভটত্ব থেকে পৃথক। বিশ্লেষণসহ তাঁর বিস্তৃত মন্তব্য :

> প্রচলিত ছড়ার ধারা বা ঐতিহ্য অনুযায়ী এগুলো রচিত হয়নি, বরং তাদের চরিত্রগুলোকে ইচ্ছে করেই আরো উদ্ভট করে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রচলিত ছড়ার চিত্রগুলো খাপছাড়া হলেও একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করেই তাদের চিত্রগুলো পরিকল্পিত হয়। বিশেষত সে সকল পরিকল্পনা যে সচেতন মনের প্রয়াস, তা' কিছুতেই বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রচিত 'খাপছাড়া'র ছড়াগুলো যে সচেতন মনের সৃষ্টি অর্থাৎ ইচ্ছে ক'রেই খাপছাড়া ক'রে রচনা করবার প্রয়াস হয়েছে, তা' অনুভব করা যায়। বাগ্‌বৈদগ্ধ জাত হাস্যরস বা ইংরেজিতে যাকে wit বলে, তাই 'খাপছাড়া'র ছড়াগুলোর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে; সুতরাং তা' বিদগ্ধ মনের আয়াসসাধ্য রচনা, কিন্তু প্রচলিত ছড়া কখনও তা' হতে পারে না।... [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৭৩ : ১৩০-৩১]

খাপছাড়া-র চরিত্রচিত্রণেও ফুটে উঠেছে একদল খাপছাড়া মানুষ; কিন্তু খগেন্দ্রনাথ মিত্রের অবলোকনে *খাপছাড়া*-র চরিত্র-বৈচিত্র্য শুধু হাসির খোরাকই জোগায় না, বরং আমাদের সমাজের কিছু নেতিবাচক চরিত্র এতে উন্মোচিত হয় :

> ..."খাপছাড়া"য় নানা বয়সের নানা চরিত্রের মানুষের দেখা পাওয়া যায় যারা সাধারণ মানুষের গণ্ডীতে পড়ে না। লোকসমাজে তারা "খাপছাড়া" আখ্যায় ভূষিত হয়ে থাকে। ... সংখ্যায় তারা অনেক। বাস্তব জীবনে এদের মতো চরিত্রের লোকের অভাব নেই। নির্লজ্জ, নির্মম, লোভী, ঔদরিক, ভীরু, শঠ, মিথ্যাবাদী, অলস, আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন ও চালবাজ প্রভৃতি বহু চরিত্র শিশুপাঠকবর্গের আসরে হাজির করে কবি যেন তাদের জীবনপথে সকৌতুকে সতর্ক করে দিয়েছেন। [খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯৬১ : ১৭৩-৭৪]

চরিত্রচিত্রণের এ-দিকটির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বাসন্তী চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণেও :

> সমাজের নানা শ্রেণীর লোকচরিত্রে যে সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য আছে তাদের প্রতি ইঙ্গিত যে এ সমস্ত রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে — তা বোধকরি অস্বীকার করা যায় না। কবি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সব সময় যে এই সমস্ত রচনার জন্ম দিয়েছেন তা হয়তো নয়, চরিত্রচিত্র এঁকেছেন কৌতুকসুখে। তবে হাসির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত অসঙ্গতি আমাদের বেশ নাড়া দিয়েও যায়। [বাসন্তী চক্রবর্তী ১৩৮৭ : ৪৪৭-৪৮]

ছড়াগুলোর মতো *খাপছাড়া*-র ইলাস্‌ট্রেশনেও দুয়েকটি ছাড়া কোথাও দৃশ্য সাজানোর চেষ্টা নেই; কতগুলো মুখচ্ছবি পেন্‌সিল বা কালির রেখায় বা তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠেছে। ঘটনার বর্ণনাও ছড়ায় সংক্ষিপ্ত; প্রতিটিতে এক বা একাধিক মানুষ অথবা কোনো গোষ্ঠী যেন একরাশ অন্তর্বিরোধ নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

চ.

রূপনির্মিতি ও ছন্দ-ব্যবহারের বৈচিত্র্যে *খাপছাড়া* ঋদ্ধ। আঙ্গিক গঠনে এত বূপভেদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর কেনো একক পদ্যগ্রন্থে আছে কীনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, কাব্যসাহিত্য কেবল রসসাহিত্য নয়, তা রূপসাহিত্যও। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮২ : ১৫৬]

খাপছাড়া-র বিপুল সংখ্যক ছড়ার সঙ্গে ইংরেজি লিমেরিকের গঠনগত সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। এদিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১৩৫৯)-এর দ্বিতীয় সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডে :

> রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলি লিখিয়াছিলেন অনেকটা ইংরেজ লেখক এডওয়ার্ড ক্লেরিহিউ বেন্‌ট্‌লির[14] প্রবর্তিত লিমেরিক ছন্দের রীতিতে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বেন্‌টলির নির্দিষ্ট ছত্রসংখ্যা মানেন নাই। শেষ ছত্রের স্বল্পাক্ষরতাও মানেন নাই। [সকুমার সেন ১৯৯৬ : ৩০৬]

আরও পরে (১৩৭৩) শুদ্ধসত্ত্ব বসুও এডওয়ার্ড লিয়রের সঙ্গে তুলনা করেছেন *খাপছাড়া*-র রবীন্দ্রনাথকে :

> ...ইংরেজীতে যাকে লিমেরিক জাতীয় ছড়া বলে — 'খাপছাড়া'র কবিতাগুলিতে লিমেরিকেরও রস পাওয়া যাবে। এমন কি এডওয়ার্ড লীয়রের দু'একটি লিমেরিকের কথা মনে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৪০৬ : ২২৮]

লিমেরিক পঞ্চছত্রের হালকা-পদ্য (light verse); প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম ছত্র এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রের অন্ত্যমিলে এর ছন্দোবন্ধ (ককখখক)। ক ছত্রগুলো ত্রিমাত্রিক; খ দ্বিমাত্রিক — ধ্বনিতে ঝোঁক এর মজ্জাগত। এর প্রথম ছত্র সাধারণত চমৎকার ও আনুষ্ঠানিক; শেষ ছত্র শ্লেষ-ব্যঙ্গ-আকস্মিকতায় পূর্ণ।

লিমেরিকের তাল/মাত্রা দ্রুতলয়ের, ভাষা কথ্যভঙ্গি-প্রধান এবং ভাবে রয়েছে সামঞ্জস্য ও বৈপরীত্যের সমাহার। মনে করা হয় যে, উনিশ শতকের শুরুতে ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধফেরত আইরিশ সৈন্যরা আয়ারল্যান্ডের লিমেরিক (Limerick) নামক শহরে এ ধরনের কবিতা চালু করেন। এডওয়ার্ড লিয়র (১৮১২-৮৮) এর সঙ্গে পরিচিত হন *Anecdotes*

and Adventures of Fifteen Gentlemen (১৮২২)-এর মাধ্যমে এবং লিমেরিককে নতুন জীবন দেন *A Book of Nonsense* (১৮৪৬)-এ। টেনিসন, সুইনবার্ন, কিপলিং, স্টিভেন্সন প্রমুখ লিমেরিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এডওয়ার্ড লিয়রের লিমেরিক পাঠ করেছিলেন, এমন কোনো নিশ্চিত তথ্য আমাদের জানা নাই। তবে রবীন্দ্রবিশারদরা মনে করেন যে, পাঠের সম্ভাবনাই বেশি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে শৈশব থেকেই কবির পরিচয়; বহুবার ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ভ্রমণ; টেনিসন, সুইনবার্ন, কিপলিং-এর কাব্য-আলোচনা প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে এ-ধারণা যথার্থ বলেই মনে হয়। অন্যদিকে গুরুসদয় দত্তের লিয়র-অনুগামী লিমেরিক সংকলন *পাগলামির পুঁথি* (১৯২২) রবীন্দ্রনাথ হয়তো পড়ে থাকবেন।[১৫] স্থূলবিচারে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে *খাপছাড়া*-য় লিমেরিক মাত্র একটি :

৮. পাখিওয়ালা বলে, 'এটা কালোরঙ চন্দনা।'
পানুলাল হালদার বলে, 'আমি অন্ধ না–
কাক ওটা নিশ্চিত, হরিনাম ঠোঁটে নাই।'
পাখিওয়ালা বলে, 'বুলি ভালো করে ফোটে নাই–
পারে না বলিতে বাবা, কাকা নামে বন্দনা।'

তবে এটির সঙ্গে লিয়রের লিমেরিকের পার্থক্য আছে; এর তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রের মাত্রা অন্য ছত্রের সমান, লিয়রে যা একমাত্রা কম।

কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ আরও অন্তত ১০টি ছড়ার মধ্যে লিমেরিকের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন; যদিও ছত্র ভাঙার ফলে আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে লিমেরিক মনে হয় না। প্রসঙ্গত, ছড়া যেহেতু একান্তই অন্ত্যমিলভিত্তিক ছত্রের/পদের দাবিদার, তাই এক্ষেত্রে আমরা অন্ত্যমিলভিত্তিক ছত্র/পদ বিচারের পক্ষপাতী। প্রসঙ্গত, *খাপছাড়া*-র ৪টি ছড়া *সঞ্চয়িতা*-য় সংকলনের সময় অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে ছত্র পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। আবার *ছন্দ*-এর একটি ছড়া *খাপছাড়া*-য় সংযোজনের সময় অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। লিমেরিকের সম্ভাবনাটা আরও সুনির্দিষ্টভাবে দেখা যায় যখন ছড়া ৭ ও ২৪-এ হাস্যরসের সঙ্গে করুণ ও ভয়ানক/বীভৎস রসের মিশ্রণ ঘটেছে।

১৪, ২০, ৪৯, ৫০, ৫২, ৬৩, ৮১, ৮৪, ৮৬ ও ১০০ সংখ্যক ছড়ার ছত্র সংখ্যা ৮; কিন্ত একে অন্ত্যমিলের বিবেচনায় পুনর্বিন্যাস করলে এর অবয়ব দাঁড়ায় ৫ ছত্রের। যেমন :

৮৪. ডাকাতের সাড়া পেয়ে/তাড়াতাড়ি ইজেরে
চোখ ঢেকে মুখ ঢেকে/ঢাকা দিল নিজেরে।
পেটে ছুরি লাগালো কি,
প্রাণ তার ভাগালো কি,
দেখতে পেলনা কালু/হল তার কী যে রে!

লিয়রীয় সংজ্ঞার্থে এটি শুদ্ধ লিমেরিক; ৮ সংখ্যক ছড়ার তুলনায়ও। এমনকি আপাত ১০ ছত্রের ছড়াও (৬৪. ৬৭. ৯০) পুনর্বিন্যাস করলে লিমেরিকের রূপ নেয় :

৬৪. একটা খোঁড়া ঘোড়ার 'পরে/চড়েছিল চাটুর্জে,
পড়ে গিয়ে কী দশা তার /হয়েছিল হাঁটুর যে!
বলে কেঁদে, 'ব্রাহ্মণেরে/বইতে ঘোড়া পারল না যে
সইত তাও, মরি আমি/তার থেকে এই অধিক লাজে —
লোকের মুখের ঠাট্টা যত/বইতে হবে টাটুর যে।'

বিষম ছত্র অবশ্য বাংলা বা ভারতীয় ছন্দে স্বাভাবিক নয়; সমাদৃতও নয়। কবি কি এর সাযুজ্য আনতেই এতে ষষ্ঠ ছত্র যুক্ত করেছিলেন? কেননা *খাপছাড়া*-র অন্তত ৮টি ছড়া (১৩, ২১, ২৬, ৩৪, ৩৭, ৪৩, ৭৭, ৯৯) ককখখকক অন্ত্যমিলের, যেখানে শেষ ছত্রকে লিমেরিকের সম্প্রসারণ বললে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেমন :

৩৪. খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার,
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার;
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে
স্বামী তবু চোখ বুজে খায় সে-
যা পায় তাহাই মুখে তোলে তার,
দোষ দিতে মুখ নাহি খোলে তার।

৬ ছত্রের পদ্য যে বাংলায় নেই তা নয়; কিন্তু তাতে সাধারণভাবে অন্ত্যমিলের রূপটি হচ্ছে ককখগগখ। *খাপছাড়া*-র একটি ছড়ায় (৭৯.) রবীন্দ্রনাথ এই রূপটি ব্যবহার করেছেন।

অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে ছত্র পুনর্বিন্যাস করলে আরও ৪২টি ছড়ায় (১, ৩, ৪, ৭, ১০, ১২, ১৬, ২৪, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৫৭, ৬১, ৬৫, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯৩, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৩) সম্প্রসারিত লিমেরিকের রূপগত সাযুজ্য চোখে পড়ে। যেমন :

৪. কাঁচড়াপাড়াতে এক/ছিল রাজপুত্তর,
রাজকন্যারে লিখে/পায় না সে উত্তর।
টিকিটের দাম দিয়ে
রাজ্য বিকাবে কি এ?
রেগেমেগে শেষকালে/ বলে ওঠে-দুত্তোর!
ডাকবাবুটিকে দিল / মুখে ডালকুত্তোর।

৪টি ছড়ায় (৬ক.খ.গ; ৩৩) ককখখকগগক অন্ত্যমিল রয়েছে। এর প্রথম ৫ ছত্র লিমেরিকের; শেষ ৩ ছত্রকে কি লিমেরিকের সম্প্রসারণ বলে বিবেচনা করা যায়? যেমন :

৬গ. পিসে হয় কুলদার, ভুলুদার কাকা সে-
আড় চোখে হাসে আর করে ঘাড় বাঁকা সে।
যবে গিয়ে শালিখায়
সাহেবের গালি খায়,
'কেয়ার করি নে' ব'লে তুড়ি মারে আকাশে।
যেদিন ফয়জাবাদে
পত্নী ফুপিয়ে কাঁদে,
'তবে আসি' ব'লে হাসি চলে যায় ঢাকা সে।

এক্ষেত্রেও ছত্র পুনর্বিন্যাস করলে আরও ৯টি ছড়ায় (৫, ১৯, ২২, ২৫, ৩০, ৫৯, ৬০, ৮৯, ৯৪) একই আঙ্গিক পাওয়া যায়।

খাপছাড়া-য় লিমেরিক-আঙ্গিকের এই বিপুল ব্যবহার এবং এর রূপান্তর নিয়ে নিরীক্ষা কতটা লিয়রীয় প্রভাবজাত, এবং এই সাযুজ্য সচেতন না আকস্মিক, সে অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য আমাদের নেই। ছত্র পুনর্বিন্যাসের এ-প্রপঞ্চটিও অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

কিছু লিমেরিকে ষষ্ঠ ছত্র এবং কিছু লিমেরিকে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ছত্র যোগ করে সুষম ছত্র করলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে বিষম ছত্রের ছড়া রচনা করেছেন। *খাপছাড়া*-য় ৭ ছত্রের দুটি, ৯ ছত্রের দুটি, ১১ ছত্রের দুটি এবং ১৩ ছত্রের একটি ছড়া আছে। এর মধ্যে ৯ ছত্রের ১৭ ও ৬৯ সংখ্যক ছড়ার প্রথম ৫ ছত্র লিমেরিকের; এর সঙ্গে গগকক অন্ত্যমিলের ৪ ছত্র যুক্ত হয়েছে। ৭ ছত্রের ৯ সংখ্যক, ১১ ছত্রের ১৮ ও ৩৮ সংখ্যক ছড়ার শুরু দ্বিপদী/২ ছত্র দিয়ে; এর সঙ্গে ত্রিপদী/৩ ছত্র, চতুর্পদী/৪ ছত্র ইত্যাদির সংযোগে ছড়াগুলো তৈরি। নানারকমের পর্ব/ছত্রের এ সংযোগও নিরীক্ষাধর্মী।

৭ চরণের ৯৫ সংখ্যক ছড়াটির দ্বিতীয় স্তবকে পঙ্ক্তি ও পর্ব/পদকে যেভাবে ভাঙা হয়েছে তাতে পঙ্ক্তির চলমানতার এক নতুন ধরন সৃষ্টি হয়েছে; মুক্তদলের উদাহরণ হিসেবেও এগুলো ব্যতিক্রমধর্মী। *বলাকার* (১৯১৬) 'ছবি', 'শা-জাহান' বা 'বলাকা' কবিতায় পঙ্ক্তি ভেঙে ছত্রের যে চলমানতা তৈরি করেছিলেন, এতে যেন তার ছড়ারূপ আমরা পাই যখন দেখি পঙ্ক্তি এবং পদ/পর্ব ছত্রের বাঁধন ছেড়ে যাচ্ছে —

৯৫.   মনোযোগহন্ত্রীর
      বেড়ি আর খন্তির
   ঝংকার মনে পড়ে; হেঁসেলের পন্থার
ব্যঞ্জন-চিন্তায় অস্থির মন তার।

মনে হয়, ছত্রবিন্যাসের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের বেশি মনোযোগ ছিল যাতে ছন্দ শিথিল না হয়। কেননা কবির মতে :

> ছন্দের শৈথিল্যে হাস্যরসের নিবিড়তা নষ্ট করে। কারণ হাস্যরসের প্রধান দুইটি উপাদান অবাধ দ্রুতবেগ এবং অভাবনীয়তা। যদি পড়িতে গিয়া ছন্দে বাধা পাইয়া যতিস্থাপন...পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্যের তীক্ষ্ণতা আপন ধার নষ্ট করিয়া ফেলে। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮২ : ১৭-১৮]

কবির এ-মন্তব্য *ভারতী*-তে (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *আষাঢ়ে* কাব্যের আলোচনায়।

১৪ ছত্রের ৬টি ছড়া আছে (১১, ২৮, ৫৫, ৫৬, ৭৬, ৮৫); কিন্তু এগুলোর সঙ্গে সনেটের কোনো সাযুজ্য নেই। *খাপছাড়া*-য় রবীন্দ্রনাথ ২০ ছত্রের একটি ছড়া লিখেছেন (৪৭); ১৮ (২৩, ৯৬) ও ১৬ ছত্রের (৫৩, ৬২) দুটি করে। বেশি ছত্রের ছড়াগুলোতে গল্প বলার প্রবণতা রয়েছে; ফলে ছন্দ এবং মেজাজে অনেক সময় এর ছড়াগুণ ক্ষুণ্ন হয়েছে।

অন্তত তিনটি ছড়ায় (৫৩, ৭৫, ৭৯) রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্র শব্দ দিয়ে একটি করে ছত্র তৈরি করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে এ-ধরনের ছত্র মাঝে মাঝে পাওয়া যায়; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো সমাসবদ্ধ শব্দ এবং একাধিক দলের। এর সংক্ষিপ্ততম রূপ রয়েছে *উৎসর্গ* (১৯১৪)-এর *'প্রচ্ছন্ন'*[১৬]-কবিতায়; *খাপছাড়া*-য় রবীন্দ্রনাথ একটি শব্দ নিয়েও একটি ছত্র তৈরি করেছেন। যেমন :

৭৯. চিন্তাহরণ দালালের বাড়ি
গিয়ে
একশো টাকার একখানি নোট
দিয়ে...
কাগজ-গন্‌তি মুনফা যতই
বাড়ে
টাকার গন্‌তি লক্ষ্মী ততই
ছাড়ে–

বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দের অন্ত্যমিল বা বাংলা শব্দকে ইংরেজি প্রত্যয়যোগে ক্রিয়ায় পরিণত করার ব্যতিক্রমও রয়েছে *খাপছাড়া*-য় :

৮৮. দিন চলে না যে, নিলেমে চড়েছে
খাট-টিপাই।
ব্যাবসা ধরেছি গল্পেরে করা
নাট্যিfy।...
ভোজন-ওজনে লেখা ক'রে দেয়
certify।

মনে হয়, এ রবীন্দ্রনাথ আমাদের তত চেনা নয়!

প্রবোধচন্দ্র সেন *খাপছাড়া-র* ছন্দ বিশ্লেষণ করে এর ছন্দোবৈচিত্র্যের নানা প্রান্ত উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁর মতে, *খাপছাড়ায়* কলাবৃত্ত একপদী (খ্যাতি আছে সুন্দরী...); কলাবৃত্ত ত্রিপদী (বাদশার মুখখানা...); কলাবৃত্ত মহাত্রিপদী (ঘাসে আছে ভিটামিন-); কলাবৃত্ত মহাচৌপদী (হাজারিবাগের ঝোপে...) প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার আছে। [প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯৭৩ : ১২৫, ১৪৬, ১৫৮, ১৫৯]

ছন্দের বিবেচনায় *খাপছাড়া* নিয়ে বাসন্তী চক্রবর্তী যে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে গ্রন্থের ছড়াত্ব নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তাঁর মতে এসব রচনা অনেক সময় অক্ষরবৃত্তের পর্যায়ে চলে গেছে:

> লৌকিক স্বরবৃত্ত বা বলবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্যটিকে রক্ষা করার চেষ্টা — কিন্তু নানা ধরনের ব্যতিক্রমও সুস্পষ্ট।... বলবৃত্ত ছন্দে অক্ষরবৃত্তের ন্যায় পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ত্রিক, কুলক — প্রভৃতি সকল রকম বন্ধেরই রবীন্দ্রনাথ জন্ম দিয়েছেন। এই সমস্ত প্রচলিত চরণবন্ধ বা স্তবকবন্ধকে আবার বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়ে নানা ভাবে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টাও করেছেন। মিলের ব্যাপারেও বিভিন্ন প্রকারের কারিকুরি লক্ষ্য করা যায়... [বাসন্তী চক্রবর্তী ১৩৮৭ : ৬৭-৬৮]

নাম তার। ডাক্তার। ময়জন
বাতাসে মে। শায় কড়া। পয়জন

গণিয়া দে। খিল, বড়ো। বহরের
একখানা। রীতিমত। শহরের
টিঁকে আছে। নাবালক। নয়জন।

পাঁচটি পঙ্‌ক্তিতে এই মাত্রাবৃত্ত কুলকটিকে রচনা করা হয়েছে। ১ম, ২য় ও ৫ম পঙ্‌ক্তির শেষে পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মিল রক্ষা করেছেন এবং এটা যথার্থ মিলের দৃষ্টান্ত। কেননা প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির অভিন্নতা অর্থাৎ পূর্ণ ধ্বনিসাম্য। ৩য় ও ৪র্থ পঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রেও ঐ একই বক্তব্য প্রযোজ্য।...

চরণগুলিকে অনেক সময় ইচ্ছানুরূপ সাজিয়ে, মিলের দিক থেকে নিত্য নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মধ্যে চমৎকারিত্ব আনার চেষ্টা করেছেন কবি। শেষের দিকের কাব্যের মধ্যে এই সমস্ত মিলের চুমকি দেখলে মনে হয় দীর্ঘদিনের চেষ্টায় তিনি যেন এখন ছন্দ নিয়ে খেলা করে চলেছেন। তার সহজ গতিভঙ্গি বন্ধনের পরিবর্তে ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে চলেছে–

বটে আমি। উদ্ধত;
নই তবু। ক্রুদ্ধ তো,
শুধু ঘরে। মেয়েদের। সাথে মোর। যুদ্ধ তো

প্রথম চরণকে দুটি পঙ্‌ক্তিতে ভেঙে সাজিয়ে এবং পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মিল রক্ষা করে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একঘেয়েমির মধ্যে। এতে ছন্দের ঢঙই যেন পাল্টে গেছে।

খাপছাড়া ও পরবর্তী দুটি ছড়াগ্রন্থের ছন্দ সম্পর্কে নীলরতন সেনের মূল্যায়নও গুরুত্বপূর্ণ। সেনের [নীলরতন সেন ১৯৯৫ : ১১০ ও ১১৩] মতে :

ক. ... লঘু যতিভঙ্গে প্রস্বর এবং রুদ্ধদলের ধ্বনি তরঙ্গ এনে সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল এবং সুকুমার রায়-অনুশীলিত এই বিশিষ্ট ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন।
খ. ... অতিপর্ব ও রুদ্ধ দলের স্পন্দন এবং মিলের ফুলঝুরি এনে, লঘুতর যতিভঙ্গের পদক্ষেপে ছড়া জাতীয় কবিতায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। [নীলরতন সেন ১৯৯৫ : ১১০ ও ১১৩]

খাপছাড়া-র ছত্রবিন্যাসশৈলী বহুবিচিত্র। এর মধ্যে কিছু জ্যামিতিক রূপ দেখে মনে হয় যে, মুদ্রণের প্রচলিত রূপ থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস। এর মধ্যে আয়তক্ষেত্র ও ত্রিভুজের সংযোগে তৈরি রূপগুলো আকর্ষণীয়।[১৭] যেমন (৯৫.) :

হরপণ্ডিত বলে, 'ব্যঞ্জন সন্ধি এ,
পড়ো দেখি, মনুবাবা, একটুকু মন দিয়ে।'
মনোযোগ হস্তীর
বেড়ি আর খস্তির
ঝংকার মনে পড়ে; হেঁসেলের পন্থার
ব্যঞ্জন-চিন্তায় অস্থির মন তার।
থেকে থেকে জল পড়ে চক্ষুর কোণ দিয়ে।

অন্য একটি ছড়া (৪৮.)র অবয়বকে এভাবে স্থাপন করা যায় :

কনের পণের আশে চাকরি সে ত্যেজেছে।
বারবার আয়নাতে মুখখানি মেজেছে।
হেনকালে বিনা কোনো কসুরে
যম এসে ঘা দিয়েছে শ্বশুরে,
কনেও বাঁকালো মুখ—
বুকে তাই বেজেছে।
বরবেশ ছেড়ে হীরু
দরবেশ সেজেছে।

চিত্রকলার কিউবিজম-এর সঙ্গে কি এর কোনো সম্পর্ক আছে? প্রসঙ্গত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ভারতী*-তে ১৩৩০-এর বৈশাখ সংখ্যায় বাংলা লোকছড়া নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে "সাহিত্যের cubism বলা যেতে পারে এই সব যা খুসি জিনিসকে..." [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৮৮ : ২৯]।

অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে শব্দ-ব্যবহারের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিশুদ্ধ তৎসম/সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে মিল দিয়েছেন অ-আত্মীকৃত ইংরেজি শব্দ দিয়ে। যেমন : ১১ সংখ্যক ছড়ায় ... জঞ্জাল মার্জন/... পুলিশের সার্জন/... নেই কোনো গার্জন/.. বিদ্যা উপার্জন। আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন তৎসমের মিলে —... কসুরে/... শ্বশুরে (৪৮)। স্বল্প প্রচলিত তৎসমও ব্যবহার করেছেন — পিষ্টক (২১), কুন্তলবৃষ্য (৫৬), হবিষ্য (৫৬), পাণি (৫৩), কিঙ্করী (১০), নক্র (৯০) ইত্যাদি। এমন কি ট্রেনিঙের (৭৮.) বা hanging (৫৮.)-এর মতো ইংরেজি অথবা মণিকর্ণিকা (১৬.)-র মত চিকিৎসাশাস্ত্রের শব্দও ব্যবহার করেছেন। *খাপছাড়া* রচনার বছর পাঁচেক আগে *পরিচয়*-এ (মাঘ ১৩৩৮) 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত ২' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শব্দ-ব্যবহারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করেছেন এভাবে :

> ...শব্দ বাছাই নিয়ে যদি প্রাকৃত বাংলাকে প্রশ্ন করা যায়, 'কী চাই, প্রাকৃত শব্দ না সংস্কৃত শব্দ', সে বলবে, 'দ্বৌ কর্তব্যৌ'। তার জাতবিচার নেই বললেই হয়। পছন্দ হবামাত্র ইংরেজি পারসি সব শব্দই সে আত্মসাৎ করে। আবার অমরকোষবিহারী বড়ো বড়ো বহরওয়ালা সংস্কৃত শব্দকে ওদেরই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৭২ : ১১৭]

দুটি ছড়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আরও সাহসী হতে চেয়েছিলেন বলে অনুমান করা যায়। এর একটিতে পাই :

৫৪. ... দানধর্মের 'পরে
মন তার নিবিষ্ট,
রোজগার করিবার
বেলা জপে 'শ্রীবিষ্ণু'–

অন্ত্যমিলের এ-দুর্বলতা অবিশ্বাস্য! রবীন্দ্রনাথ কী আসলে 'শ্রীকেষ্ট'/'শ্রীকিষ্ট' লিখতে চেয়েছিলেন? দ্বিতীয় ছড়ায় পাওয়া যায়–

৮৯. ... যদি করে ডাকাতি,
পারি নে যে তাকাতেই,...

রবীন্দ্রনাথ কী এখানে 'তাকাতি' লিখতে চেয়েছিলেন?

ছন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। *খাপছাড়া* রচনার প্রায় সমকালে কলিকাতা বিশ্বভারতী-সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন *প্রবাসী* (আষাঢ় ১৩৪৩)-তে তা প্রকাশিত হয়। কবি এতে বলেন :

> অল্প বয়সে প্রথমটা... তখনকার প্রচলিত ছন্দ অনুকরণের চেষ্টা অল্পকাল কিছু করেছি। অকস্মাৎ একসময় খাপছাড়া হয়ে কেমনভাবে নিজের ছন্দে পৌঁছলাম।...আমার কাব্যজীবনে দেখছি ক্রমাগত এক পথ থেকে অন্য পথে চলবার প্রবণতা...। এক একটা ছন্দ বা ভাবের পর্ব যখন শেষ হয়ে এসেছে বোধ হয় তখন নূতন ছন্দ বা ভাব মনে না এলে আর লিখিই নে।... [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৭২ : ১৭৫-৭৬]

ছড়ার একটি প্রচলিত বিশিষ্ট আকর্ষণ অনুপ্রাস ও যমক *খাপছাড়া*-য় বিরল। প্রবোধচন্দ্র সেন ৪৩ ও ৭৯ সংখ্যক ছড়ার মধ্যে যমকের উপস্থিতির কথা বলেছেন (প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯৯০ : ৮৭]। সুকুমার রায়ের ধারার ছড়া অনুপ্রাস ও যমক-বহুল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে অনুপ্রাস "যখন ভাব ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয়" তখন তা "কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে"; কিন্তু এর বাইরে অনুপ্রাসের ব্যবহার "মনকে উত্তেজিত" করতে পারে, তবে তাতে "সৌন্দর্যের সরলতা" ও "ভাবের গভীরতার" অভাবে "কবিতা ইতরতা প্রাপ্ত হয়" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮২ : ১৬]।

ছড়ায় সাধু বাংলার ছন্দের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল, কেননা সে-ছন্দে ছড়া "বাঁধলে পালিস-করা আবলুস কাঠের মতো পিছল হয়ে ওঠে।" কবির মতে ছড়া "চলতি ভাষার কাব্য"। কিন্তু *খাপছাড়া*-য় তদ্ভব-প্রাধান্য অনেক সময় রক্ষিত হয়নি; এমনকি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেও সাধুরূপের ব্যবহার আছে — তাহাই (৩৪.), খুঁজিয়া (৪৩.), কহিনু তাহারে (৫৬.), করিতে চাও (৫৬.), কহিল (৫৬.), ঠকিলাম (৭৫.), ইত্যাদি।

ছড়ার নিজস্ব কিছু ভাষাভঙ্গি রয়েছে। তাই ছড়ার খোকাখুকু জুতোর বদলে 'জুতুয়া' পরে; নদীর বদলে বন্যা আসে 'নদেয়'-তে। *খাপছাড়া*-তেও রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন, পায়ে-ধরোয়া, দই-বাহিক, কাঁদুনিক, নির্‌বাধুনিক, চড়োয়া, হতভম্বা, ধ্বংসনে, পস্তানা, সই-বাহিক, জাগর, সামিগ্‌গির, নড়িষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, এড়ায়নে, খলতার প্রভৃতি। পরে *গল্পসল্প* (১৯৪০)-এ অবশ্য আমরা দেখেছি "হিদিককার" (হৃদয়+হিক্‌কা+ধিক্‌কার) শব্দের ব্যবহার; বাচস্পতির মুখে "সম্মমরাট", "উথ্থংসিত" প্রভৃতি।[১৮] ছড়া বলেই জানলা অনায়াসে রূপান্তরিত হয়েছে 'জালনা'য়; ব্যাখ্যা ব্যাখ্যানায়, চাই চেহোতে, কতবা কথম্‌বা-য়। এমন কি 'কিবে' বা 'করতেছে'-র মতো মৌখিক বুলিও ব্যবহার করেছেন কবি।

খাপছাড়া-র কয়েকটি ছড়ার ভাষা বিশ্লেষণ করে প্রবোধচন্দ্র ঘোষ মন্তব্য করেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের ছড়াকাব্যের ভাষা যেন কাগজের নৌকা, যার গতির ও অঙ্গের সৌকুমার্যের কাছে যান্ত্রিক জলযান যেন লজ্জায় বিনত হয়ে পড়ে। এই ভাষার প্রতি কি যে গভীর মমতা ছিল কবির তার পরিচয় পাই যখন দেখি প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে শেষ পর্যায় পর্যন্ত বার বার তিনি

> ব্যবহার করে চলেছেন এই ভাষা পূর্ণ প্রভুত্ব সহকারে কতোরকমের কবিতায়। এই ভাষা ও এই সুর কৌতুকের ছড়া থেকে ছড়িয়ে গেছে বেদনার কাব্যে। [প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ১৯৭৩ : ১০৮]

ছড়ার আরেকটি লক্ষণ বিশিষ্ট চরিত্রসৃষ্টি। লোকছড়ার 'হাট্টিমা টিম টিম'[১৯] বা 'বর্গী এল দেশে' বা 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি'-এ ধরনেরই চরিত্র। *খাপছাড়া*-তে পাই 'দাড়ীশ্বর', 'গণেশ ধুরন্ধর', 'ডাক্তার ময়জন', 'হাস্যদমনকারী গুরু বশীশ্বর' ও শিষ্য' 'হসীশ্বর'; পরীক্ষক 'মসীশ্বর' এবং 'হাস্যরসীশ্বর', 'শর্মা বাণেশ্বর', 'চিনুলাল হরিরাম মোতিভয়' — এমন সব চরিত্র।

খাপছাড়া-র রচনাগুলি যে অনায়াসসাধ্য নয় এবং হঠাৎ করে রচিত হয় নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বহু সংখ্যক রচনার পাঠ পরিবর্তনের মধ্যে। বাসন্তী চক্রবর্তী তাঁর গবেষণায় এর দুটি ৮২ ও ৯৪ সংখ্যক ছড়ার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, ৮২-র যে তিনটি পূর্বপাঠ পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটি পাঠই খাপছাড়াভাবে সার্থক। গৃহীত পাঠের সঙ্গে বর্জিত পাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় রূপের মিল সামান্য। তৃতীয় পাঠটি গৃহীত পাঠের অনেকখানি কাছাকাছি। বাসন্তী চক্রবর্তীর মতে, ৯৪-র গৃহীত পাঠের সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠের ভাবের দিক থেকে তেমন প্রভেদ নেই। প্রথম পাঠের দু-একটি ভাষার অদল-বদল করে দ্বিতীয় পাঠ; দ্বিতীয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ গৃহীত পাঠ। বাসন্তী চক্রবর্তীর অবলোকন :

> এইভাবে যতক্ষণ না ভাব দানা বেঁধে উঠেছে কবি একের পর এক শব্দ পরিবর্তন করে চলেছেন। তুলনায়, গৃহীত পাঠ ক্রমে ক্রমে সাজ বদল করে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। [বাসন্তী চক্রবর্তী ১৩৮৭ : ১৬৫]

এভাবে হালকা কথা বলতে বলতে চরণ পরিবর্তন করে তৈরি করেছেন গুরুতর কথা [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯০ : ১৫৭] :

প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ— বাদশার ফরমাশে সন্দেশ বানাতে
খুব কষে মাখে চিনি কুঁকড়োর ছানাতে।...
তৃতীয় পাঠ — বাদশার ফরমাসে সন্দেশ বানাতে
ছানা ছেড়ে মাখে চিনি কুঁকড়োর ছানাতে।...
চতুর্থ পাঠ— মহারাজা লুকিয়েছে পুলিশের থানাতে।
চোরকে সে পারে নাই আদালত মানাতে।...

চূড়ান্ত পাঠ— ৮২. মহারাজ ভয়ে থাকে
পুলিশের থানাতে,
আইন বানায় যত
পারে না তা মানাতে।...

ছ.

খাপছাড়া-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সনের মাঘ মাসে; রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এটিই গ্রন্থের একমাত্র সংস্করণ। এতে মোট ১০৫টি ছড়া ছিল; প্রবেশক, উৎসর্গ, ভূমিকা নিয়ে আরও ৩টি। ১৩৫৩ সনে *রবীন্দ্র রচনাবলী*-র ২১তম খণ্ডে *খাপছাড়া*

অন্তর্ভুক্ত হয়; এতে আরও ২৪টি ছড়া সংযোজিত হয়। এর ১,২,৩ সংখ্যক ছড়া *প্রহাসিনী* (১৩৫৫)-র "খাপছাড়া" অংশ থেকে নেওয়া; ৪-২০ সংখ্যাভুক্ত ১৭টি ছড়া ইতঃপূর্বে অপ্রকাশিত এবং ২১-২৪ সংখ্যক *ছন্দ* থেকে গৃহীত। *খাপছাড়া* দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৭২) ২, ৩, ৫, ১০ ও ১১ বাদ দেওয়া হয়; এর ২, ৫ ও ১১ স্থান পায় *চিত্র বিচিত্র* (১৩৬১)-এ। দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত ছড়ার সংখ্যা ১৯ (১-১৯)।

দ্বিতীয় সংস্করণের হিসেবে ২-১৫ সংখ্যক ছড়া রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত। এর ২, ৩ ও ১১ পাণ্ডুলিপির "খাপছাড়া-গুচ্ছ" থেকে নেওয়া হয়েছে; বাকি ১১টি অন্যান্য পাণ্ডুলিপি থেকে। এই ১৪টি ছড়ার কোনোটিরই রচনাকালের উল্লেখ নেই। তবে যেহেতু "খাপছাড়া-গুচ্ছ" থেকে *খাপছাড়া*-য় ছড়া নেওয়া হয়েছে তাতে সংযোজনের ২, ৩ ও ১১ সংখ্যক ছড়া মূল গ্রন্থের সমকালীন মনে করা যায়; অর্থাৎ ১৯৩৬ অথবা এর পূর্বের রচনা। *ছন্দ* থেকে নেওয়া শেষ ৪টি ছড়া প্রকৃতপক্ষে আলোচনার উদাহরণ। ছড়া ১৬ পৌষ ১৩৩৮, ১৮ ও ১৯ মাঘ ১৩৩৮ এবং ১৭ সংখ্যক ছড়া সেপ্‌টেম্বর ১৯৩৩ এ রচিত–সে বিবেচনায় এগুলি ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাচীনতর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সংযোজনের প্রথম ছড়াটি ৫ বৈশাখ ১৩৪৪ সনে শান্তিনিকেতনে রচিত।

ছন্দ থেকে গৃহীত ৪টি ছড়াই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ছন্দের উদাহরণ দিতে গিয়ে। ১৬ সংখ্যক "বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিকে... অতি সহজেই বাড়ানো-কমানো"; ১৭ "বিষমমাত্রামূলক ছন্দ"; ১৮ শব্দব্যবহারে ইংরেজি সংস্কৃত "জাতবিচার" না মানার এবং "ছোটো পয়ারের ছিবলেমির" উদাহরণ রূপে ১৯। অবশ্য *ছন্দ*-এ ১৭ ছড়াটি ৮ ছত্রের, *খাপছাড়া*-য় তা ৪ ছত্রে উপস্থাপিত। এই ৪টি ছড়ায় আমরা ৪ জন উদ্ভট চরিত্রের মানুষের দেখা পাই — প্রথম জন "কাঁধে মই" নিয়ে "ভুঁইচাঁপা গাছ" খোঁজে, "কইমাছ" "খোঁজে" "দইভাঁড়ে ছিপ" ফেলে, "ঝাউপাতা" দিয়ে "লাউ রাঁধে" "ঘুঁটেছই" মেখে। দ্বিতীয়জনের চোখ শিমুলের মতো রাঙা; কিন্তু তাঁর নাক ঘ্রাণ ছাড়া অন্য কোনো গুণে আস্থা রাখে না। তৃতীয় জন "আইডিয়াল"; "প্র্যাক্‌টিক্যাল" বুদ্ধির অভাবে ঘরে "হাঁড়ি" "চড়ে" না — পরিণতিতে মৃত্যুপথযাত্রা থামাতে অক্সিজেন লাগে। চতুর্থজন "বোলচাল"-এ পটু "সাজ ফিট্‌ফাট্‌", চশমা দিয়ে "আড়ে" চোখে "চায়"।

সংযোজনের শেষ ৪টি ছড়ার কৌতুক-ব্যঙ্গ মূল গ্রন্থের ছড়াগুলোর তুলনায় অনেক নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম। মনে হয় যেন কবি অনেক দূর থেকে সংক্ষিপ্ত ধ্বনিসংকেতে একটি অবয়ব তৈরি করছেন যা অনেকটা ছড়ার মতো, অথচ কৌতুকে পরিপূর্ণ। সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যে চরিত্র বা ঘটনাকণা তুলে ধরেন, পাঠককে তা অনুধাবন করতে হয় নিজের উপলব্ধি শানিত করে বা মেধার প্রয়োগে। ঘটনা পরিবর্তনের দ্রুততা একে আরও জটিল ও আকর্ষণীয় করে তোলে। যেমন :

সংযোজন ১৭.

শিমুল রাঙা রঙে চোখেরে দিল ভ'রে।
নাকটা হেসে বলে, 'হায় রে যাই ম'রে।'
নাকের মতে, গুণ কেবলি আছে ঘ্রাণে,
রূপ যে রঙ খোঁজে নাকটা তা কি জানে।[২০]

কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত রূপ আর গন্ধের মধ্যে দ্বন্দ্ব (অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২:৩২৫)। কেতকী কুশারী ডাইসন মনে করেন, এটি শিমুল ফুল সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য, তবে এতেও "ফুলটি সত্যিই প্রত্যক্ষ হয়", "না কি নাকের হাসিটাই জয়ী হয়" এ নিয়ে তাঁর সন্দেহ [কেতকী কুশারী ডাইসন ১৯৯৭ : ৬৫৬]।

ছন্দ থেকে গৃহীত ৪টি ছড়াই আশ্চর্যজনকভাবে ইংরেজি ক্লেরিহিউ আঙ্গিকের সঙ্গে মেলে। এ-ধারার ছড়ার প্রচলন করেন এডমন্ড ক্লেরিহিউ বেন্‌টলি। চার ছত্রের এ ছড়ার প্রতি ছত্রে দুটি পর্ব — রসিকতা, চতুরতা ও বিদ্রূপ এবং শ্লেষপূর্ণ তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাময় উক্তির উচ্চারণ এর বৈশিষ্ট্য। ইংরেজি সংস্কৃতিতে ঘরোয়া আসরে ক্লেরিহিউ দিয়ে খেলা জনপ্রিয় [CUDDON ১৮৮৬:১২৪]।

ক্লেরিহিউর তুলনায় সংযোজনের ছড়াগুলোর ছত্র সামান্য দীর্ঘ; দুই পদের মধ্যে অন্ত্যমিল এর উপরি পাওনা। দ্রুত দৃশ্যপটের পরিবর্তন ও শিল্পসংযমের সমন্বয়ে নিম্নের ছড়াটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক:

সংযোজন ১৬.

কাঁধে মই, বলে 'কই ভুঁইচাঁপা গাছ',
দইভাঁড়ে ছিপ ছাড়ে, খোঁজে কইমাছ,
ঘুঁটেছাই মেখে লাউ, রাঁধে ঝাউপাতা —
কী খেতাব দেব তায় ঘুরে যায় মাথা।

তবে সংযোজন ১৯ ইংরেজি ক্লেরিহিউর আরও নিকটবর্তী :

খুব তার বোলচাল, সাজ ফিট্‌ফাট্‌,
তকরার হলে আর নাই মিট্‌মাট্‌।
চশমায় চম্‌কায়, আড়ে চায় চোখ —
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

সংযোজনের ছড়াগুলোর মধ্যে অন্তত আরও ৩টি (৩, ৯ ও ১৩) একই আঙ্গিকের। এর মধ্যে ৩ সংখ্যক ছড়াটিতে গিন্নি ও গিনি এবং শোনা ও সোনার দ্ব্যর্থকতা দিয়ে তৈরি কৌতুক মনোমুগ্ধকর :

গিন্নির কানে শোনা ঘটে অতি সহজেই
'গিনি সোনা এনে দেব' কানে কানে কহ যেই।...

বাংলায় সচেতনভাবে প্রথম ক্লেরিহিউ রচনা করেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর *উড়কি ধানের মুড়কি* (১৯৪২)-তে ক্লেরিহিউ আঙ্গিকের ছড়া আছে।[২১] রবীন্দ্রনাথের ক্লেরিহিউ আঙ্গিকের রচনাগুলো এর প্রায় অর্ধযুগ আগের। তবে রবীন্দ্রনাথ ক্লেরিহিউ-র আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন থেকে এগুলি লিখেছিলেন কি না, সে-সম্পর্কে কোনো তথ্য আমাদের নেই। যদি আমরা এ-রচনাগুলোকে ক্লেরিহিউর অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে মানতে হয় যে রবীন্দ্রনাথই বাংলায় প্রথম ক্লেরিহিউ রচয়িতা। নতুন নতুন রূপগঠনের প্রতি কবির যে আগ্রহ, এটি তার সঙ্গে মেলে।

ছড়া ১৩ ও ১৪ এক নবিশ ছবি আঁকিয়ের প্রসঙ্গে — প্রথমটিতে "হঠাৎ আনাড়ি কবি/তুলি হাতে আঁকে ছবি" এবং দ্বিতীয়টিতে "পেন্‌সিল টেনেছিনু হপ্তায় সাতদিন,/রবার ঘষেছি শেষে তিনমাস রাতদিন"। এ দুটি কী কবির চিত্রকলা-চর্চা নিয়ে আত্মকৌতুক?

সংযোজনের ১১ সংখ্যক ছড়াটি মূল গ্রন্থের ৮ সংখ্যক ছড়ার একই অন্ত্যমিলে রচিত — চন্দনা/মন্দ না/ বন্দনা/ অন্ধ না। চন্দনা এখানে পাখি নয়, "খিটখিটে" মেজাজের "কুঁজো" "কালো" কনে; কথক বরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন "তোমাকে মানাবে ভায়া,/অতিশয় মন্দ না"।[২২] একই ছন্দোবন্ধ নিয়ে দুটি পৃথক রসের সার্থক ছড়ার যথার্থ উদাহরণ এটি।

সংযোজনের ছড়া-১৫ "নরাণাং মাতুলক্রম"; ৭ দাম্ভিক রমণী এবং ৫ টাক নিয়ে কৌতুক। ৯ সংখ্যক ছড়া বাঙালির হাতপাতার অভ্যাসকে ব্যঙ্গ, যারা অফিসে "খেটে মরা"র চেয়ে "ঝুলি ধরা"-কেই "ঢের ভালো" মনে করে। কেউ কেউ মনে করেন যে ৮ সংখ্যক ছড়ার "ঝাঁকড়া...খোঁচা-খোঁচা ছাঁটা ছাঁটা" "গোঁফের" "জর্মন প্রোফেসর" শান্তি নিকেতনের জার্মান অধ্যাপক মরিস হ্বিন্‌টারনিৎস্‌কে নিয়ে [অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২:৩২৪]। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় তার বৈদিক ব্যাখ্যা মুখনির্গত হওয়ার সময় গোঁফের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়।[২৩]

১২ সংখ্যক ছড়ায় পাতালের বলিরাজার সঙ্গে ভূতলের ঘাসিরামের "লড়াই লাগালো বেগে"; যুদ্ধ জমে উঠেছে ভূমিকম্পের মতো। কিন্তু পরিণতিতে "চারি দিকে হাহাকার করে ওঠে গ্রামরা"। এরপরই যুদ্ধ নিয়ে কবি মৌলিক প্রশ্নটি তুলেছেন, "মানুষ কহিল,... তবু মরি কেন আমরা।" প্রথম মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু এবং তার চেয়েও বড়ো মহাযুদ্ধের আশঙ্কার মুখে রবীন্দ্রনাথের এ প্রশ্ন বিশ্ববিবেকেরই প্রশ্ন।

সংযোজনের ৪ সংখ্যক ছড়া শূন্যবাদের অনুশীলন নিয়ে কৌতুক। ধীরু শূন্যে মজে "নিরাধার" সত্যের ভজন-প্রয়াসী। কিন্তু "সারারাত" "সারাদিন" "ছুটে মরে" "হয়রান" হয়েও —

আমিহীন ঘোড়াহীন
আপনারে নাহি পড়ে নজরে।

সংযোজনের ১ ও ২ সংখ্যক ছড়া গল্পধর্মী; এ দুটো *খাপছাড়া-র* সঙ্গে খাপ খায় নি।

জ.

খাপছাড়া নিয়ে আরও দুয়েকটি সংশয় এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন বিবেচনা করা যায়। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *খাপছাড়া*-কে নামকরণ বা অন্য কোনোভাবে ছড়া বলে দাবি করেন নি এবং এই না করার কারণ কী?

এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। ভট্টাচার্যের দাবি :

> 'খাপছাড়া'র রচনাগুলোকে রবীন্দ্রনাথ নিজে কোথাও ছড়া ব'লে উল্লেখ করেন নি। কারণ, তিনি এ'কথা নিশ্চয় জান্‌তেন যে কেবল মাত্র চিত্র উদ্ভট এবং ভাবার্থ সঙ্গতিহীন হ'লেই তা ছড়া হয় না, ছড়ার আরও কতকগুলো সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৭৩ : ১৩১]

স্পষ্টত আশুতোষ ভট্টাচার্যের বিবেচনায় এগুলো উদ্ভট ও ভাবসঙ্গতিহীন হলেও ছড়ার অন্যান্য গুণ এতে অনুপস্থিত। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন :

> ...প্রচলিত ছড়ার মধ্যে এই শ্রেণীর উদ্ভট চিত্র কখনও স্থান লাভ করতে পারে না। প্রচলিত খেলার ছড়াগুলোর মধ্যে যে সকল চিত্র থাকে, তা' শিশুর জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য; তা' কখনও সচেতনভাবে উদ্ভট ক'রে রচিত হয় না। কিন্তু 'খাপছাড়া'র ছড়াগুলোতে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে চিত্রগুলো উদ্ভট করে রচনা ক'রেছেন। সেইজন্যই 'খাপছাড়া'র রচনাগুলোকে ছড়া বলা যায় না, রবীন্দ্র-মানসের সচেতন সৃষ্টি ব'লেই তাদের মনে করতে হয়। এদের মধ্যে ছন্দ গঠন এবং শব্দ প্রয়োগের যে নৈপুণ্য দেখা যায়, তা' সর্বত্র ছড়ার অনুগামী নয়, বরং তার পরিবর্তে তা বিদগ্ধ মনের সৃষ্টি বলেই মনে হ'বে। [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৭৩ : ১৩১]

আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেছেন *ছড়ার ছবি*-র আলোচনার যেখানে শিরোনাম না দেওয়া সংক্ষিপ্ততার জন্য *খাপছাড়া*-র রচনাগুলোকে বলছেন ছড়াধর্মী এবং *ছড়ার ছবি*-কে কবিতাধর্মী [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৭৩:১৩২]।

খাপছাড়া-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *সে* গ্রন্থের একটা নৈকট্যের কথা বলেছেন বিশ্লেষকরা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, *সে* "ব্রহ্মার খেয়ালের স্বপ্ন", আর *খাপছাড়া* "তাঁর পাগলের অট্টহাসি। কিন্তু দুই-ই এক। অবসরের আনন্দে, খেলার খুশিতে, স্বপ্নের জাল বোনবার খেয়ালিপনায়, রবীন্দ্রনাথের উত্তর-জীবনে এই বই দুখানির আবির্ভাব।" শুদ্ধসত্ত্ব বসুর মতে, একই মানস-অনুবর্তন রয়েছে *সে* ও *খাপছাড়া* গ্রন্থে। [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৪০৬ : ২২৮]

বুদ্ধদেব বসুও *খাপছাড়া*-কে স্থাপন করতে চান *সে* ও *গল্পসল্প*-র সঙ্গে। তাঁর বিবেচনায় :

> এদের আমি রাখবো — শিশুসাহিত্যের বিভাগে নয়, স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে, এদের বলবো প্রতিভাবানের খেয়াল, অবসরকালের আত্মবিনোদন, চিরচেনা রবীন্দ্রনাথেরই নতুনতর ভঙ্গি একটি। [বুদ্ধদেব বসু ১৯৭৬ : ৬১]

দ্বিতীয় প্রশ্ন, *খাপছাড়া* কাদের জন্য? *কবিতা* (আষাঢ় ১৩৪৫) পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু *খাপছাড়া-র* যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তাতে মনে করা যায়, "এ-গ্রন্থ পরিণত মনের উপভোগ্য, যাতে রয়েছে আত্মসচেতন বৈদগ্ধের...চিহ্ন"; যদিও তার ধ্বনি-ঝংকারে শিশু আনন্দ পায়:

> 'খাপছাড়া' মহাকবির অবসরের ফুলকি — আবোল তাবোল ভালো কবির শ্রেষ্ঠ সাধনা। 'খাপছাড়া'য় পদে-পদে অপ্রত্যাশিত চমক লাগানো মিলের চকমকি, ছন্দটা হালকা চালের, এবং ঠাট্টার ইঙ্গিতগুলি এমন তির্যক ছাঁদে বিচ্ছুরিত যে কোনো শিশু যে তা পড়ে হাসতে পারবে এমন সম্ভাবনা অল্পই। ছন্দ-মিলের ঝঙ্কারে শিশুর মন খুশী হবে; কিন্তু সম্পূর্ণ রসটা বয়স্ক মনেরই উপভোগ্য।[বাসন্তী চক্রবর্তী ১৩৮৭ : ৪৪৪]

সুকুমার সেনও *খাপছাড়া*-র বয়স্ক উপভোগ্যতার কথা বলেছেন। সেনও মনে করেন যে, "খাপছাড়া জাতীয় "ছড়া-কবিতার রস" বাহ্যত ছেলেদের জন্য লেখা হইলেও রবীন্দ্রনাথের ছড়া-কবিতার রস পরিণত মনেরই বেশি উপভোগ্য এবং যেগুলির ভাব ও ভাষা অত্যন্ত

সহজ সেগুলির মধ্যেও ছন্দের বৈচিত্র্য ও কল্পনার উদ্ভটতা বিচিত্র রস সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেইজন্য ছেলে-বুড়ো সকলেই সমান উপাদেয়।" [সুকুমার সেন ১৯৯৬ : ১৫৯] তবে এর আঙ্গিক ও চিত্রময়তা যে শিশুদের আকৃষ্ট করবে সে বিষয়টিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি :

> 'খাপছাড়া' ছড়ার সংকলন।... উজ্জ্বল ছবি ও ছবিখণ্ড হিসাবে ছড়াগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। আপাত মনে হয় বুঝি ছোটোদের জন্য লেখা। কিন্তু এগুলির রস ছোটোদের অপেক্ষা বড়োদেরই বেশি উপভোগ্য। দুই একটিতে অত্যন্ত সমুজ্জ্বল মিনিয়েচার গল্পিকাও আছে। [সুকুমার সেন ১৯৯৬ : ৩০৬]

সুকুমার সেন অন্যত্র লক্ষ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কবিপ্রতিভায়" ও "বাণীশিল্পে" ছেলে ভুলানো ছড়া অত্যন্ত "অন্তরঙ্গ"। তাঁর ভাষায় "প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনায় ছেলেভুলানো ছড়ার ও গল্পের রঙ পাকা হইয়া লাগিয়াছিল।" খাপছাড়ার "অদ্ভুত-কৌতুকরস উচ্ছলিত "রচনাগুলি সেনের মতে "শেষ বয়সে" "খাঁটি ছড়ার শৈলীতে"..."নূতন রসসৃষ্টি"... [সুকুমার সেন ১৯৯৬ : ১৫৯]

এর সঙ্গে বাসন্তী চক্রবর্তী যুক্ত করেন :

> বুদ্ধিদীপ্ত এই সমস্ত ব্যঙ্গকৌতুকের যে অর্থ বা যে ধরনের হাসির খোরাক এ সমস্ত ছড়া যোগায় তা শিশুমানসের পক্ষে ততখানি উপভোগ্য নয় — যতখানি বড়দের পক্ষে। তাছাড়া এমন অনেক কঠিন শব্দ, ইংরাজী শব্দ বা বিদেশী শব্দ আছে যার অর্থ বোঝাও কেবলমাত্র অপরিণত শিশুমনের সামর্থ্যে কুলায় না। সুতরাং একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে "খাপছাড়া"য় আমাদের জগৎ ও জীবনের "খাপছাড়া" অসঙ্গত দিকটাকে নিয়ে কৌতুক করে কবি ছোটোবড়ো সকল চিত্তকেই হাস্যরস যুগিয়েছেন। ... এ রচনা যেন তাঁর শেষজীবনের অন্যতম সোনার ফসল। [বাসন্তী চক্রবর্তী ১৩৮৭ : ৪৪৮]

শুদ্ধসত্ত্ব বসু অবশ্য উপভোগ্যতার বিবেচনায় শিশু-বয়স্কদের এই দ্বন্দ্বকে একটি মীমাংসায় আনার চেষ্টা করেছেন এভাবে:

> 'খাপছাড়া'র কবিতাগুলি ছোটদের উপযোগী করে লেখা, এবং প্রত্যেকটিতেই হাসির ও আনন্দের খোরাক আছে। বিষয়বস্তুতে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে, যা সাধারণতঃ ঘটে না, যা ঘটা সম্ভব নয়, যা সম্পূর্ণ অনুচিত তাকেই ঘটানো হয়েছে। অনুচিত বিষয়কে উপযুক্ত ছন্দের পোশাক পরিয়ে উজ্জ্বল মনোরম মিলের তকমা এঁটে হাজির করা হয়েছে এমন কৌশলে — যাতে শুধু ছোটদের নয়, ছোটদের অভিভাবকবর্গকেও তৃপ্তি না দিয়ে পারে না। অদ্ভুত, আজগুবি সুন্দরের পোশাক পরে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে।
> ভোজবিদ্যায় পারদর্শী জাদুকর যেমন ধাঁধা সৃষ্টি করে জাদু দেখায়, কবি আজ ছন্দের সম্মোহিত জাদুবিদ্যায় তেমনি কথার তামাশা দেখাতে চেয়েছেন।...
> ...ছড়াগুলির ছন্দের আকর্ষণ যেমন, তেমনি আজগুবি রসেরও আমন্ত্রণ। তবে কয়েকটি ছড়া কিশোর মনের পক্ষে রসগ্রহণের অনুকূল নয়, যেমন — 'আমিহীন ঘোড়াহীন' যে-আত্মস্বরূপ — সেই 'আপনারে' শিশুদের 'নজরে' পড়ার কথা নয়। অবশ্য বেশীর ভাগ ছড়া-কবিতাই কিশোর বয়সের উপযোগী। [শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৪০৬ : ২২৮-২৯]

লীলা মজুমদার রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক রচনাবলির ভূমিকা লিখতে গিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন :

> কেউ কেউ বলেন, খুব ছোটোদের কথা মনে করে রবীন্দ্রনাথ সহজ পাঠ ছাড়া কিছু লেখেন নি। সেটিও পাঠ্যপুস্তক বৈ তো নয়। কথাটাতে এইটুকুই সত্যি যে তাঁর লেখা ছোটোদের কবিতা-গল্পতেও খোকামি খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথাও বড়োজোর ছোটো ছেলে তার মাকে বলল, 'খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না, মা।' আসলে কবি শৈশবকে একটা থেমে থাকার বয়স বলেই মনে করতেন না। নদীর মতো যে জীবনের স্রোত বয়ে যায় তাকে থামিয়ে রাখা যায় না। ছোটোরা প্রতি মুহূর্তেই বড়ো হচ্ছে। কেমন করে ভালোভাবে বড়ো হতে হয়, তারই পাঠ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯০ : ৫]

লীলা মজুমদার অন্যত্র বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য যা লিখেছেন সেসব পড়লে মনে হয় ছোটদের বুঝবার ক্ষমতার উপর কবির ভারি শ্রদ্ধা ছিল। আরো অনেক চিন্তাশীল লেখকের মতে ছোটদের আর বড়দের সাহিত্যের মধ্যে একটা রেখা টেনে দুটি ভাগ করে দেওয়া যায় না। যা-কিছু ছোটরা বুঝতে পারে, বিষয় আর ভাষা উভয় দিক থেকে দেখলে সে সমস্তই শিশুসাহিত্যে স্থান পেতে পারে। আবার ছোটদের জন্য লেখা বইয়ের মধ্যে কেবল সেগুলিকেই ভালো বলা চলে যেগুলি বিশ্বসাহিত্যের সভাতেও আসন পাবার যোগ্য। [পুলিনবিহারী সেন ১৩৬৮ : ২৯২]

একই অনুরণন দেখা যায় নবেন্দু সেনের বিশ্লেষণে :

> অনেকেই মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্য খুব কমই লিখেছেন। কবিমনের দার্শনিকতায় শৈশব-সরলতা আচ্ছন্ন হয়েছে বার বার। কাব্যের প্রগাঢ় তত্ত্বে শিশুসাহিত্যের প্রাঞ্জলতা রুদ্ধ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া এক পরম গভীর শ্রদ্ধাবোধ থেকেই শিশুমন নিয়ে ভেবেছেন। [নবেন্দু সেন ২০০০ : ৬৯]

জীবনস্মৃতি-র 'ঘরের পড়া'য় কবি তাঁদের শৈশব-কৈশোরের পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে বর্ণনায় প্রায় একই মনোভাব পোষণ করেছেন :

> তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই।... এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণ জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলেভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। [রবীন্দ্রনাথ ১৪০২, ৯ : ৮৫১-৫২]

বুদ্ধদেব বসুও মনে করেন :

> রবীন্দ্রনাথ — পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে — সত্যিকার ছোটোদের বই একখানাও লেখেননি। সেটা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে, তিনি যে বড্ড বেশি বড়ো লেখক।...
> রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে শিশুকে দেখেছেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদবোধে ব্যথিত হয়েছেন, বার-বার তৃষিত হয়েছেন তাকে ফিরে পাবার জন্য। [বুদ্ধদেব বসু ১৯৭৬ : ৬১, ৬৩]

শিশুসাহিত্যের পৃথক বিভাজনে রবীন্দ্রনাথেরও সায় ছিল কি না সন্দেহ! অবনীন্দ্রনাথকে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে "সকলের সহিত যে চলতে পারে তাই হচ্ছে সাহিত্য, আমার এই মত।... ছেলেদের ছেড়ে কবি হওয়া যায় না।" [অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬ : ৩৭০]

গল্পসল্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এর একটা সমাধান দিয়েছিলেন। রাণী চন্দকে ১৯৪১-এর ২৬ মে, মৃত্যুর মাস দুই আগে হেসে বললেন :

> এটা অন্যায়, ছোটো গল্পগুলি ছেলেরা দখল করতে চায়, কিন্তু হাত ফসকে যায়। আসলে এর ভিতরের খবর বড়োদের জন্যই। [রাণী চন্দ ১৩৫১ : ১২৩]

আমাদের বিবেচনায় ছড়া শিশুর জন্য যেমন হতে পারে, পরিণত মানুষের জন্যও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায় বা অন্নদাশঙ্কর রায়ের বহু ছড়া পরিণত মনের জন্য। আকৃতিতে, ছন্দ-বিবেচনায়, বিষয়-বিচার ও উপস্থাপনা ভঙ্গিতে *খাপছাড়া*-র প্রায় সকল রচনাই উৎকৃষ্ট ছড়া। অন্নদাশঙ্কর রায়ের উক্তি এখানে প্রসঙ্গিক হবে

> কোনটা ছড়া কোনটা ছড়া না....কান দিয়ে যাচাই করতে বলব। সেই সঙ্গে মেজাজ দিয়ে। [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৮৮ : ৩৩] :

খাপছাড়া-র মূল উপজীব্য ঝাঁঝালো ব্যঙ্গকৌতুকের বিচক্ষণতায় বুদ্ধিদীপ্ত হাসি আর এ-হাসি তৈরি হয়েছে অদ্ভুত উদ্ভট অস্বাভাবিক অবাস্তব অপ্রত্যাশিত অসংগত আপাতবিরোধী অনুচিত অতিরঞ্জিত তির্যক ঠাট্টার ইঙ্গিত ও ঘটনায়। চকিতে আমাদের মনে পড়ে যায় সুকুমার রায়ের *আবোল তাবোল* (১৯২৩)-এর প্রারম্ভিক উক্তি — "যাহা আজগুবি, যাহা অসম্ভব ...।" আবার উপস্থাপনায় কৌতুক ও হাসি অক্ষুণ্ন রেখেই দেশ, সমাজ ও মানুষের জীবনের নিত্যদিনের গভীর সংকটের কথা ফুটে উঠেছে *খাপছাড়া*-য়।

খাপছাড়ার পরও রবীন্দ্রনাথ আরও দুটি ছড়াগ্রন্থ লিখেছিলেন — *ছড়ার ছবি* (১৯৩৭) ও *ছড়া* (১৯৪১)। তবে ছড়ার আকৃতি ও প্রকৃতি বিবেচনায় *খাপছাড়া*-ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুদ্ধ ছড়ার গ্রন্থ।

টীকা

১. ঈশ্বর গুপ্তের এ-পদ্যাংশটি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক বক্তৃতায় ব্যবহার করেছিলেন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯) খাঁটি বাংলার ছন্দবৈচিত্র্য, বিশেষত ব্যঙ্গকবিতায় খাঁটি বাংলার জোর সংক্রান্ত উদাহরণ হিসেবে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮২ : ১৭০]।

২. রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে একই ধরনের আর একটি রচনা পাওয়া গেছে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯০ : ১৫৯] :

অটোগ্রাফের খাতাখানা খুলে/লিখতে তুমি আমায় কহ যে,
সহজ কথা গিয়েছ হায় ভুলে/যায় না লেখা এতই সহজে।

৩. শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত *মুকুল*-এর ১ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা (আশ্বিন ১৩০২) থেকে ফাল্গুন ১৩০৮ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ৪/৫টি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। অগ্রহায়ণ ১৩২৫-এর পর *মুকুল* আর প্রকাশিত হয়নি। তাহলে এখানে "মুকুলের জন্য" কথাটি অসীমাংসিতই থেকে যাচ্ছে।

৪. তবে *সঞ্চয়িতা*-য় সংকলনের সময় এর ৪টি ছড়া (২, ১২, ২৪, ৮২)-র নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে 'দামোদর শেঠ', 'গোরা বোষ্টম বাবা', 'বর এসেছে বীরের ছাঁদে' এবং 'রাজব্যবস্থা'।

৫. পুষ্প, শ্যামলা, একাকিনী, প্রভেদ, যুগল, ঝাঁকড়া চুল ও বিদায়।

৬. তুলনীয়, সুকুমার রায়ের 'কি মুস্কিল' (১৩২৪) :

সব লিখেছে এই কেতাবে দুনিয়ার সব খবর যত,...
... কেবল দেখ পাচ্ছিনেকো লেখা কোথায় —
পাগ্‌লা ষাঁড়ে কর্‌লে তাড়া কেমন ক'রে ঠেকাব তায়!

৭. কবির *প্রহাসিনী*-র 'রঙ্গ' কবিতার খসড়ায় পাওয়া যায় :

কঠিন পাথর, কঠিন লোহা, কঠিন বটে ইষ্টক
তাহার অধিক কঠিন কন্যা তোমার হাতের পিষ্টক।

৮. তুলনীয়, কাজী নজরুল ইসলামের ছড়া :

মক্‌টু মাইতি বাঁটকুল রায়
ক্রুদ্ধ হ'য়ে যুদ্ধে যায়
বেঁটে খাঁটো নিট্‌পিটে পায়
ছেৎরে চলে কেৎরে চায়।...

৯. এ-ছড়াটিতে ঠাকুরবাড়ির দরজি নিয়ামত খলিফার স্মৃতি থাকতে পারে। কবির *জীবনস্মৃতি*-তে নিয়ামত খলিফার প্রসঙ্গ আছে।

১০. তুলনীয়, অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ানাট্য 'জনরব' (১৯৪২)-এর প্রথম দু-চরণ :

ইষ্টিশনে করছ কী?
সত্যচরণ মুস্তফি...

১১. সুকুমার রায়ের 'গানের গুতোঁ'র (১৩২২) ভীষ্মলোচন শর্মার গানের দাপে আকাশ কাঁপে; ঠাণ্ডা হয়েছিলেন পাগলা ছাগলের শিঙের গুতোঁয়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ 'গানের গুঁতো'য় সুর দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে ১৯৩৫-এ। বৈষ্ণব কবিতার বাইরে অন্যের লেখায় সুর দেওয়ার ঘটনা কবিজীবনে খুব বেশি নেই।

১২. পরে এ-চিঠি *বিশ্বপরিচয়*-এর ভূমিকা রূপে মুদ্রিত হয়।

১৩. কবির *প্রহাসিনী*-র 'রঙ্গ' কবিতার খসড়ায় পাওয়া যায় :

স্বপ্ন ফাঁকি প্রেত ফাঁকি ফাঁকি যাত্রার সং
তাহার অধিক ফাঁকি কন্যা আধুনিকের ঢং।

১৪. সুকুমার সেন সম্ভবত অনবধানতাবশত এডওয়ার্ড লিয়র-এর স্থলে এডওয়ার্ড ক্লেরিহিউ বেন্‌ট্‌লি লিখেছেন; লিয়র লিমেরিকের নবজন্মদাতা। এডমন্‌ড ক্লেরিহিউ বেন্‌টলি ক্লেরিহিউর জনক।

১৫. অন্নদাশঙ্কর রায়ও প্রথম লিমেরিক লিখেছিলেন ১৯৩৭-এ; পরে সেটি *রাঙা ধানের খই* (১৯৪৯)-তে গ্রন্থভুক্ত হয়। অন্নদশঙ্করের স্বীকারোক্তি অনুসারে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে ছড়া রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ-প্রেক্ষাপটে অন্নদাশঙ্করের এ-লিমেরিক কবি কর্তৃক পাঠের সম্ভাবনা আছে। তবে *খাপছাড়ার* লিমেরিক সম্ভবত এর আগে মুদ্রিত হয়েছে।

১৬. স্বপনে, গোপনে, আলোকে, পুলকে

১৭. এ পর্যবেক্ষণ *খাপছাড়া*-র দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ অবলম্বনে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ এবং পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করলে এ বিষয়ে আরও সঠিক মন্তব্য করা সম্ভব।

১৮. সুকুমার রায়ের 'খিচুড়ি' (১৩২২)-তে শব্দ তৈরির খেলা আরও মৌলিক — হাঁসজারু, বকচ্ছপ, হাতিমি প্রভৃতি। তবে এতে ঝোঁকটা শব্দ তৈরির চেয়ে অদ্ভুত প্রাণী তৈরির দিকেই বেশি।

১৯. তবে এ-ধরনের চরিত্রগুলোকে যতটা কাল্পনিক মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা নয়। এর পেছনেও বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেমন, 'বাক বাকুম পায়রা' ছড়াটির "বাক বাকুম"-কে আপাত অর্থহীন মনে হয়; কিন্তু বাক বাকুম আসলে পায়রার একটি বিশেষ প্রজাতি। "হাট্টিমা টিম" সম্ভবত হট্টিটি পাখির প্রতিচ্ছবি। এর বৈজ্ঞানিক নাম Vaneus Cinerus। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে এ-পাখি "টিটি চ্যাগা" নামে পরিচিত। পাখির মাথায় শিং সম্ভবত কাল্পনিক সংযোজন।

২০. তুলনীয়, সুকুমার রায়ের ছড়া (১৩২৪) :

এক যে ছিল সাহেব, তাহার
গুণের মধ্যে নাকের বাহার।...

২১. অন্নদাশঙ্করের ক্লেরিহিউ *উড়কি ধানের মুড়কি*-তে ১৯৪২-এ অন্তর্ভুক্ত হলেও এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৪-এ। এর ৬টি ক্লেরিহিউর বিষয় — জগদীশ বসুর আবিষ্কার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশভ্রমণ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মঞ্চায়ন, নেহেরুর রাজনীতি প্রভৃতি। যেমন :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
চায়না কিংবা পেরু না
সেই খানেই তো করুণা!

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এ-ছড়া দেখেছেন। প্রসঙ্গত এর সমকালেই অন্নদাশঙ্করকে কবি ছড়া লিখতে বলেছিলেন এবং অন্নদাশঙ্কর তাতে সহজেই "দীক্ষিত" হয়েছিলেন।

২২. তুলনীয়, সুকুমার রায়ের পাত্র বিষয়ক ছড়া (১৩২২) :

... মন্দ নয়, সে পাত্র ভাল —
রঙ যদিও বেজায় কালো;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক প্যাচাঁর মতন।

২৩. তুলনীয়, সুকুমার রায়ের 'গোফ চুরি' (১৩২২) :

... নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা।
এমন গোঁফত রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।

গ্রন্থপঞ্জি

অজিত দত্ত ১৯৬০
বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস । কলকাতা : জিজ্ঞাসা।
অনুত্তম ভট্টাচার্য ২০০২
রবীন্দ্ররচনাভিধান, চতুর্থ খণ্ড । কলকাতা : দীপ প্রকাশন।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬
অবনীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড । কলকাতা : প্রকাশ ভবন।
আবু সয়ীদ আইয়ুব ১৯৯৭
পান্থজনের সখা। কলকাতা : দেজ পাবলিশিং।
আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৭৩
রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য। কলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড্ কোম্পানী প্রা. লি.।
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪০৪ (১৩৫০)
রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা। কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী।
কেতকী কুশারী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারী ১৯৯৭
রঙের রবীন্দ্রনাথ । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯৬১
রবীন্দ্র শিশু-সাহিত্য পরিক্রমা। কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা. লি.।
খনা মুখোপাধ্যায় ১৯৭৮
রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায়। কলকাতা : জিজ্ঞাসা।
নীলরতন সেন ১৯৯৫ (১৯৬২)
আধুনিক বাংলা ছন্দ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
নবেন্দু সেন ২০০০
বাংলা শিশু সাহিত্য । কলকাতা : পুথিপত্র প্রাইভেট লিমিটেড।
পুলিনবিহারী সেন (সম্পা.) ১৩৬৮

রবীন্দ্রায়ণ, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : বাকসাহিত্য।
প্রণতি মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) ১৯৮৮
রবীন্দ্রভাবনা, দ্বাদশ বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা। কলকাতা।
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ১৯৭৩
রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য। কলকাতা : রূপা অ্যান্ড সন্স।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৯৫ (১৩৬৬)
রবীন্দ্র জীবনকথা। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪০১ (১৩৬৩)
রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, চতুর্থ খণ্ড । কলকাতা : বিশ্বভারতী।
বাসন্তী চক্রবর্তী ১৩৮৭
রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য। কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী।
বুদ্ধদেব বসু ১৯৭৬
সাহিত্যচর্চা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
মৈত্রেয়ী দেবী ১৯৬৭ (১৯৪৩)
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা : রূপা অ্যান্ড সন্স।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৬
লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ১ । কলকাতা : বিশ্বভারতী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮২
ছন্দ (প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পা.) । কলকাতা : বিশ্বভারতী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯০ (১৩৪৩)
খাপছাড়া। কলকাতা : বিশ্বভারতী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯৩
কৈশোরক। কলকাতা : বিশ্বভারতী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২*
রবীন্দ্র রচনাবলী। কলকাতা : বিশ্বভারতী।
রানী চন্দ ১৩৫১ (১৩৪৯)
আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা : বিশ্বভারতী।
শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৩৪৩
রবীন্দ্রকাব্যের গোধুলি পর্যায়। কলকাতা : মণ্ডল বুক হাউস।
সত্যেন্দ্রনাথ রায় ১৩৮৯
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগত। কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ।
সুকুমার সেন ১৯৯৬
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
সুকুমার সেন ১৯০৭ (১৯৬৫)
বাংলার সাহিত্য ইতিহাস। নতুন দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি।
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৮৮
ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি। ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
CUDDON, J.A. 1986
A Dictionary of Literary Terms. Middlesex : Penguin Books.
Sishir Kumar Das 1996
The English Writings of Rabindranath Tagore. New Delhi : Sahitya Akademi.

* প্রকাশকালের পরবর্তী সংখ্যা খণ্ডনির্দেশক।